মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত

বীরাঙ্গনা কাব্য

(সটীক পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ)

অধ্যাপক এ. এল. ব্যানার্জী, এম. এ.

সম্পাদিত
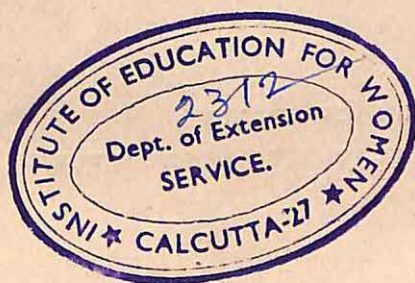
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম খণ্ড

কাব্য-পাঠ

"এই প্রাচীন দেশে দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষের কথা বিবাদের স্থল—নিশ্চয়স্থল হইলেও শ্রীহর্ষ বাঙালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন। স্মরণীয় বাঙালীর অভাব নাই। কুল্লুকভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দদাস, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন-নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল। কাল প্রসন্ন, সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও। তাহাতে নাম লেখ, 'শ্রীমধুসূদন'।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

প্রকাশকের নিবেদন

মধুসূদন যে একজন গীতিকবি ছিলেন ও তাঁহার কবি-মানসে রোমান্টিক কাব্যাদর্শও যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা কাব্য দুইখানি। এক হিসাবে বীরাঙ্গনা কাব্য তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ন্যায় আমরা মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'রও একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। এই সংস্করণে বীরাঙ্গনা কাব্যের বিশদ সমালোচনা আছে এবং প্রত্যেকটি পত্রিকার পৃথক পৃথক বিশ্লেষণও আছে। পাঠশুদ্ধির দিকেও যথেষ্ট যত্ন লওয়া হইয়াছে।

বর্তমানে মধুসূদনের সাহিত্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. ও এম.এ. পরীক্ষার পাঠ্যতালিকাভুক্ত। সেইজন্য ছাত্রদিগের কথা বিশেষভাবে মনে রাখিয়া ইহা সম্পাদনা করা হইয়াছে। কাব্যানুরাগী সাধারণ পাঠকবর্গ যাহাতে উপকৃত হন, সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

পূর্বের ন্যায় এই গ্রন্থ সম্পাদনেও সুসাহিত্যিক শ্রীমণি বাগচি আমাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। ইতি—

আশ্বিন
১৩৫৯

প্রকাশক

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

কবি-প্রশস্তি

প্রতিভার বলে সেই চরণ-শৃঙ্খল
কাটিয়া যে জনে,
মধুর অমিত্রাক্ষরে, তুলিয়া স্বরগোপরে,
দেখাইল তিলোত্তমা 'মুকুতা যৌবনে'।

রত্নসৌধকিরীটিনী স্বর্ণ লঙ্কাপুরে,
লইয়া তোমারে ;
মৈথিলী অশোকবনে, প্রমীলা সজ্জিত রণে,
প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে বীর-অহঙ্কারে,

দেখাইল ;—বেড়াইল কল্পনার পক্ষে
লইয়া তোমারে,
স্বর্গমর্ত্ত্যধরাতলে, প্রচণ্ড জলধিতলে ;
শুনাইল "মেঘনাদ" গম্ভীর ঝঙ্কারে।

বঙ্গ-ভাষা-সুললিত-কুসুম-কাননে
কত লীলা করি',
কাঁদাইয়া গৌড়জন, সে কবি মধুসূদন
চলিল,—বঙ্গের মধু বঙ্গ পরিহরি'।

যে অনন্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া,
কবিতা-ভাণ্ডারে ;
অনন্ত কালের তরে, গৌড়-মন-মধুকরে
পান করি', করিবেক যশস্বী তোমারে।

১৮৭৩
জুলাই

—নবীনচন্দ্র সেন

কবি-সম্বর্ধনা

[বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসী-দ্বারা প্রকাশ্যে সম্বর্ধিত হইবার সৌভাগ্য বোধ হয় মধুস্থদনের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে। ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬১ তারিখে কবির অন্যতম গুণগ্রাহী কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে মধুস্থদনকে নিজগৃহে সম্বর্ধনা করেন। উক্ত সম্বর্ধনা-সভায় কলিকাতার বহু বিশিষ্ট বিদগ্ধমণ্ডলীর সম্মুখে কবিকে এই মানপত্রখানি উপহার দেওয়া হইয়াছিল।]

মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধুস্থদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু। কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনীসভার সবিনয় সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং।

যে প্রকারে হউক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত্ন করাই আমাদের উচিত, কর্ত্তব্য, অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য।...আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্ব্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গালা ভাষায় আদিকবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অনুত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্রবার ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্য কার্য্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেথানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবে তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসিগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ক্রটি করিবেন না।

আজি আমরা যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনা আপনি ধন্য ও কৃতার্থন্মন্য হইলাম, হয়ত সেদিন তাঁহারা আপনার অদর্শনজনিত দুঃসহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচ আপনি সে সময় বর্ত্তমান না থাকুন, বাঙ্গালা ভাষা যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমরা আপনার সহবাস স্থখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্নবান হউন। আপনা কর্ত্তৃক যেন ভাবি বঙ্গসন্তানগণ নিজ দুঃখিনী জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রুজল মার্জ্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দ্বারা যে বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজি ভাষা সপত্নীর পদাবনত হইয়া চিরসন্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়।

কলিকাতা
বিদ্যোৎসাহিনীসভা
২ ফাল্গুন, ১৭৮২ শতাব্দা

বিদ্যোৎসাহিনীসভা সভ্যবর্গাণাম্

বীরাঙ্গনা কাব্য

প্রথম সর্গ

দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা

[শকুন্তলা বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও মেনকানাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, জনক-জননী কর্ত্তৃক শৈশবাবস্থায় পরিত্যক্ত হওয়াতে, কণ্বমুনি তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। একদা মুনিবরের অনুপস্থিতিতে রাজা দুষ্মন্ত, মৃগয়াপ্রসঙ্গে তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিলে, শকুন্তলা রাজ-অতিথির যথাবিধি অতিথিসৎকার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাজা দুষ্মন্ত, শকুন্তলার অসাধারণ রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া, এবং তিনি যে ক্ষত্রকুলোদ্ভবা, এই কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্ত হন। পরে রাজা তাঁহাকে গুপ্তভাবে গান্ধর্ব্ববিধানে পরিণয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। রাজা দুষ্মন্ত, স্বরাজ্যে গমনান্তর, শকুন্তলার কোন তত্ত্বাবধান না করাতে, শকুন্তলা রাজসমীপে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে
রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?
হায়, আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী!
হেরি যদি ধূলারাশি, হে নাথ, আকাশে; ৫
পবন-স্বনন যদি শুনি দূর বনে;
অমনি চমকি ভাবি,—মদকল করী,
বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে,
পদাতিক, বাজীরাজী, স্বরথ, সারথি,
কিঙ্কর, কিঙ্করী সহ! আশার ছলনে ১০
প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া, ডাকি সখীদ্বয়ে;
কহি—'হাদে দেখ্, সই, এত দিনে আজি
স্মরিলা লো প্রাণেশ্বর এ তাঁর দাসীরে!
ওই দেখ্, ধূলারাশি উঠিছে গগনে!
ওই শোন্ কোলাহল! পুরবাসী যত ১৫
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে!'

নীরবে ধরিয়া গলা কাঁদে প্রিয়ম্বদা ;
কাঁদে অনসূয়া সই বিলাপি বিষাদে !
  দ্রুতগতি ধাই আমি সে নিকুঞ্জ-বনে,
যথায়, হে মহীনাথ, পূজিনু প্রথমে 20
পদযুগ ; চারি দিকে চাহি ব্যগ্রভাবে।
দেখি প্রফুল্লিত ফুল মুকুলিত লতা ;
শুনি কোকিলের গীত, অলির গুঞ্জর,
স্রোতোনাদ, মরমরে পাতাকুল নাচি ;
কুহরে কপোত, সুখে বৃক্ষশাখে বসি, ২৫
প্রেমালাপে কপোতীর মুখে মুখ দিয়া।
সুধি গঞ্জি ফুলপুঞ্জে ;—'রে নিকুঞ্জ শোভা,
কি সাধে হাসিস্ তোরা ? কেন সমীরণে
বিতরিস্ আজি হেথা পরিমল-সুধা ?'
কহি পিকে, 'কেন তুমি, পিককুল-পতি, ৩০
এ স্বরলহরী আজি বরিষ এ বনে ?
কে করে আনন্দধ্বনি নিরানন্দ কালে ?
মদনের দাস মধু ; মধুর অধীনে
তুমি ; সে মদন মোহে যাঁর রূপ গুণে,
কি সুখে গাও হে তুমি তাঁহার বিরহে ?' ৩৫
অলির গুঞ্জর শুনি ভাবি—মৃদু স্বরে
কাঁদিছেন বনদেবী দুঃখিনীর দুঃখে !
শুনি স্রোতোনাদ ভাবি—গম্ভীর নিনাদে
নিন্দিছেন বনদেব তোমায়, নৃমণি,—
কাঁপি ভয়ে, পাছে তিনি শাপ দেন রোষে। ৪০
কহি পত্রে—'শোন্, পত্র ;—সরস দেখিলে
তোরে, সমীরণ আসি নাচে তোরে লয়ে
প্রেমামোদে ; কিন্তু যবে শুখাইস্ কালে
তুই, ঘৃণা করি তোরে তাড়ায় সে দূরে ;—
তেমতি দাসীরে কি রে ত্যজিলা নৃপতি ?' ৪৫
  মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে ;

ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি াইব সত্বরে
পাদপদ্ম! কাঁপে হিয়া দুরুদুরু করি
শুনি যদি পদশব্দ! উল্লাসে উন্মীলি
নয়ন, বিষাদে কাঁদি হেরি কুরঙ্গীরে! ৫০
গালি দিয়া দূর তারে করি করাঘাতে!
ডাকি উচ্চে অলিরাজে; কহি,—'ফুলসখে
শিলীমুখ, আসি তুমি আক্রম গুঞ্জরী
এ পোড়া অধর পুনঃ! রক্ষিতে দাসীরে
সহসা দিবেন দেখা পুরুকুলনিধি!' ৫৫
কিন্তু বৃথা ডাকি, কান্ত। কি লোভে ধাইবে
আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,—
শুখাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে?
 কাঁদিয়া প্রবেশি, প্রভু, সে লতামণ্ডপে,
যথায়—ভাবিয়া দেখ, পড়ে যদি মনে, ৬০
নরেন্দ্র; যথায় বসি, প্রেমকুতূহলে,
লিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী;—
যথায় সহসা তুমি প্রবেশি, জুড়ালে
বিষম বিরহজ্বালা! পদ্মপর্ণ নিয়া
কত যে কি লিখি নিত্য কব তা কেমনে? ৬৫
প্রভু প্রভঞ্জনে কহি কৃতাঞ্জলি-পুটে;—
'উড়ায়ে লেখন মোর, বায়ুকুলরাজা,
ফেল রাজপদ তলে, যথা রাজালয়ে
বিরাজেন রাজাসনে রাজকুলমণি!'
সম্বোধি কুরঙ্গে কভু কহি শূন্যমনে;— ৭০
'মনোরথ-গতি তোরে দিয়াছেন বিধি,
কুরঙ্গ! লেখন লয়ে, যা চলি সত্বরে
যথায় জীবিতনাথ! হায়, মরি আমি
বিরহে! শৈশবে তোরে পালিনু যতনে;
বাঁচা রে এ পোড়া প্রাণ আজি কৃপা করি!' ৭৫
 আর যে কি কই কারে, কি কাজ কহিয়া,

নরেশ্বর? ভাবি দেখ, পড়ে যদি মনে,
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা সখীদ্বয় বিনা,
নাহি জন জানে, হায়, এ বিজন বনে
অভাগীর দুঃখ-কথা! এ দুজন যদি ৮০
আসে কাছে, মুছি আঁখি অমনি; কেন না
বিবশা দেখিলে মোরে রোষে ঋষিবালা,
নিন্দে তোমা, হে নরেন্দ্র, মন্দ কথা কয়ে!—
বজ্রসম অপবাদ বাজে পোড়া বুকে!
ফাটি অন্তরিত রাগে—বাক্য নহি ফোটে! ৮৫
আর আর স্থল যত, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ভ্রমি সে সকল স্থলে! যে তরুর মূলে
গন্ধর্ব্ববিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে,
যে নিকুঞ্জে ফুলশয্যা সাজাইয়া সাধে
সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে,— ৯০
কি ভাব উদয়ে মনে, দেখ মনে ভাবি,
ধীমান্, যখন পশি সে নিকুঞ্জ ধামে!—
হে বিধাতঃ, এই কি রে ছিল তোর মনে?
এই কি রে ফলে ফল প্রেমতরু-শাখে?
এইরূপে ভ্রমি নিত্য আমি অনাথিনী, ৯৫
প্রাণনাথ! ভাগ্যে বৃদ্ধা গৌতমী তাপসী
পিতৃষসা,—মনঃ তাঁর রত তপজপে;
তা না হলে, সর্ব্বনাশ অবশ্য হইত
এত দিনে! নাহি সাধ বাঁধিতে কবরী
ফুলরত্নে আর, দেব! মলিন বাকলে ১০০
আবরি মলিন দেহ; নাহি অন্নে রুচি;
না জানি কি কহি কারে, হায়, শূন্যমনে!
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, পড়ি ভূমিতলে,
হারাই সতত জ্ঞান; চেতন পাইয়া
মিলি যবে আঁখি, দেখি তোমায় সম্মুখে! ১০৫
অমনি পসারি বাহু ধাই ধরিবারে

পদযুগ ; না পাইয়া কাঁদি হাহারবে!
কে কবে, কি পাপে সহি হেন বিড়ম্বনা!
কি পাপে পীড়নে বিধি, শুধিব তা কারে?
    দয়া করি কভু যদি বিরামদায়িনী ১১০
নিদ্রা, সুকোমল কোলে, দেন স্থান মোরে,
কত যে স্বপনে দেখি কব তা কেমনে?
স্বর্ণ-রত্ন-সংঘটিত দেখি অট্টালিকা ;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত দুয়ারে দুয়ারী
দ্বিরদ ; সুবর্ণাসন দেখি স্থানে স্থানে ; ১১৫
ফুলশয্যা ; বিদ্যাধরী-গঞ্জিনী কিঙ্করী ;
কেহ গায়, কেহ নাচে ; যোগায় আনিয়া
বিবিধ ভূষণ কেহ ; কেহ উপাদেয়
রাজভোগ! দেখি মুক্তা মণি রাশি রাশি,
অলকা-সদনে যেন! শুনি বীণা-ধ্বনি ; ১২০
গন্ধামোদে মাতে মনঃ, নন্দন-কাননে—
(শুনেছি এ কথা, নাথ, তাত কণ্বমুখে)
নন্দন-কাননান্তরে বসন্তে যেমনি!
তোমায়, নৃমণি, দেখি স্বর্ণসিংহাসনে!
শিরোপরি রাজছত্র ; রাজদণ্ড হাতে, ১২৫
মণ্ডিত অমূল্য-রত্নে ; সসাগরা ধরা,
রাজকর করে, নত রাজীব-চরণে!
কত যে জাগিয়া কাঁদি কব তা কাহারে?
    জানে দাসী, হে নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র-সদৃশ
ঐশ্বর্য্য, মহিমা তব ; অতুল জগতে ১৩০
কুল, মান, ধনে তুমি, রাজকুলপতি!
কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব! সেবিবে
দাসীভাবে পা দুখানি—এই লোভ মনে,—
এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে!
বন-নিবাসিনী আমি, বাকল-বসনা, ১৩৫
ফলমূলাহারী নিত্য, নিত্য কুশাসনে

শয়ন ; কি কাজ, প্রভু, রাজসুখ-ভোগে ?
আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে
রোহিণী ; কুমুদী তাঁরে পূজে মর্ত্ত্যতলে !
কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে ! ১৪০

চির অভাগিনী আমি ! জনক জননী
ত্যজিলা শৈশবে মোরে, না জানি, কি পাপে ?
পরান্নে বাঁচিল প্রাণ—পরের পালনে !
এ নব যৌবনে এবে ত্যজিলা কি তুমি,
প্রাণপতি ? কোন্ দোষে, কহ, কান্ত, শুনি, ১৪৫
দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরণ-যুগে ?

এ মনে যে সুখ-পাখী ছিল বাসা বাঁধি,
কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে,
নরাধিপ ? শুনিয়াছি রথীশ্রেষ্ঠ তুমি,
বিখ্যাত ভারতক্ষেত্রে ভীম বাহুবলে ; ১৫০
কি যশঃ লভিলা, কহ, যশস্বি, বিনাশি—
অবলা-কুলের বালা আমি—সুখ মম !
আসিবেন তাত কণ্ব ফিরি যবে বনে ;
কি কব তাহারে, নাথ, কহ, তা দাসীরে ?
নিন্দে অনসূয়া যবে মন্দ কথা কয়ে, ১৫৫
অপবাদে প্রিয়ম্বদা তোমায়,—কি বলে
বুঝাবে এ দোঁহে দাসী, কহ তা দাসীরে ?
কহ, কি বলিয়া, দেব, হায়, বুঝাইব
এ পোড়া পরাণ আমি—এ মিনতি পদে !

বনচর চর, নাথ ! না জানি কিরূপে ? ১৬০
প্রবেশিবে রাজপুরে, রাজ-সভাতলে ?
কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে
তৃণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে !
জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে শকুন্তলাপত্রিকা নাম
প্রথম সর্গ

দ্বিতীয় সর্গ

সোমের প্রতি তারা

[যৎকালে সোমদেব—অর্থাৎ চন্দ্র—বিদ্যাধ্যয়ন করণাভিলাষে দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রমে বাস করেন, গুরুপত্নী তারাদেবী তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিমোহিতা হইয়া, তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্তা হন; সোমদেব, পাঠ সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা দিয়া বিদায় হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে, তারাদেবী আপন মনের ভাব আর প্রচ্ছন্নভাবে রাখিতে পারিলেন না; ও সতীত্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সোমদেবকে এই নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখেন। সোমদেব যে এতাদৃশী পত্রিকাপাঠে কি করিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই! পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত আছেন।]

কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি,
তোমারে অভাগী তারা? গুরুপত্নী আমি
তোমার, পুরুষরত্ন; কিন্তু ভাগ্যদোষে,
ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি!—
কি লজ্জা! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি, ৫
লিখিলি এ পাপ কথা,—হায় রে, কেমনে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোরে! হস্তদাসী সদা
তুই; মনোদাস হস্ত; সে মনঃ পুড়িলে
কেন না পুড়িবি তুই? বজ্রাগ্নি যদ্যপি
দহে তরুশিরঃ, মরে পদাশ্রিত লতা! ১০
হে স্মৃতি, কুকর্ম্মে রত দুর্ম্মতি যেমতি
নিবায় প্রদীপ; আজি চাহে নিবাইতে
তোমায় পাপিনী তারা! দেহ ভিক্ষা, ভুলি
কে সে মনঃ-চোর মোর, হায়, কেবা আমি!
ভুলি ভূতপূর্ব্ব কথা,—ভুলি ভবিষ্যতে! ১৫
এস তবে, প্রাণসখে; দিনু জলাঞ্জলি
কুলমানে তব জন্যে,—ধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়ে!
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল-বিহঙ্গিনী
উড়িল পবন-পথে, ধর আসি তারে,
তারানাথ!—তারানাথ? কে তোমারে দিল ২০

এ নাম, হে গুণনিধি, কহ তা তারারে !
এ পোড়া মনের কথা জানিল কি ছলে
নামদাতা ? ভেবেছিনু, নিশাকালে যথা
মুদিত-কমল-দলে থাকে গুপ্তভাবে
সৌরভ, এ প্রেম, বঁধু, আছিল হৃদয়ে ২৫
অন্তরিত ; কিন্তু – ধিক্, বৃথা চিন্তা, তোরে !
কে পারে লুকাতে কবে জ্বলন্ত পাবকে ?
এস তবে, প্রাণসখে ! তারানাথ তুমি ;
জুড়াও তারার জ্বালা ! নিজ রাজ্য ত্যজি,
ভ্রমে কি বিদেশে রাজা, রাজকাজ ভুলি ? ৩০
সদর্পে কন্দর্প নামে মীনধ্বজ রথী,
পঞ্চ খর শর তূণে, পুষ্পধনুঃ হাতে,
আক্রমিছে পরাক্রমি অসহায় পুরী ;—
কে তারে রক্ষিবে, সখে, তুমি না রক্ষিলে ?
যে দিন,—কুদিন তারা বলিবে কেমনে ৩৫
সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল
আঁখি তার চন্দ্রমুখ,—অতুল জগতে !—
যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম ৪০
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ সলিলে !
এ পোড়া বদন মুহুঃ হেরিনু দর্পণে ;
বিনাইনু যত্নে বেণী ; তুলি ফুলরাজী
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে !
চির পরিধান মম বাকল ; ঘৃণিনু ৪৫
তাহায় ! চাহিনু, কাঁদি বন-দেবী-পদে,
দুকূল, কাঁচলী, সিঁতি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতাহার কাঞ্চী কটিদেশে !
ফেলিনু চন্দন দূরে স্মরি মৃগমদে ।
হায় রে, অবোধ আমি ! নারিনু বুঝিতে ৫০

সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে ?
কিন্তু বুঝি এবে, বিধু! পাইলে মধুরে,
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী!
তারার যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি!
বিদ্যালাভ-হেতু যবে বসিতে, সুমতি, ৫৫
গুরুপদে ; গৃহকর্ম্ম ভুলি পাপীয়সী
আমি, অন্তরালে বসি শুনিতাম সুখে
ও মধুর স্বর, সখে চির-মধু-মাখা!
কি ছার, নিগম, তন্ত্র, পুরাণের কথা ?
কি ছার, মুরজ, বীণা, তুম্বকী ? ৬০
বর্ষ বাক্যসুধা তুমি! নাচিবে পুলকে
তারা, মেঘনাদে মাতি ময়ূরী যেমতি!
গুরুর আদেশে যবে গাভীবৃন্দ লয়ে,
দূর বনে, সুরমণি, ভ্রমিতে একাকী
বহুদিন ; অহরহঃ, বিরহ-দহনে, ৬৫
কত যে কাঁদিত তারা, কব তা কাহারে—
অবিরল অশ্রুজল মুছি লজ্জাভয়ে!
গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে,
সুধানিধি, মুদি আঁখি, ভাবিতাম মনে
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি, ৭০
মান-ভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরণে!
আশীর্ব্বাদ-ছলে মনে নমিতাম আমি!
গুরুর প্রসাদ-অন্নে সদা ছিলা রত,
তারাকান্ত ; ভোজনান্তে আচমন-হেতু
যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে ৭৫
বহির্দ্বারে, কত যে কি রাখিতাম পাতে
চুরি করি আনি আমি, পড়ে কি হে মনে ?
হরীতকী-স্থলে, সখে, পাইতে কি কভু
তাম্বুল শয়নধামে ? কুশাসন-তলে,
হে বিধু, সুরভি ফুল কভু কি দেখিতে ? ৮০

হায় রে, কাঁদিত প্রাণ হেরি তৃণাসনে ;
কোমল কমল-নিন্দা ও বরাঙ্গ তব,
তেঁই, ইন্দু, ফুলশয্যা পাতিত দুঃখিনী !
কত যে উঠিত সাধ, পাড়িতাম যবে
শয়ন, এ পোড়া মনে, পার কি বুঝিতে ? ৮৫
পূজাহেতু ফুলজাল তুলিবারে যবে
প্রবেশিতে ফুলবনে, পাইতে চৌদিকে
তোলা ফুল। হাসি তুমি কহিতে, সুমতি,
"দয়াময়ী বনদেবী ফুল অবচয়ি,
রেখেছেন নিবারিতে পরিশ্রম মম !" ৯০
কিন্তু সত্য কথা এবে কহি, গুণনিধি ;—
নিশীথে ত্যজিয়া শয্যা পশিত কাননে
এ কিঙ্করী ; ফুলরাশি তুলি চারি দিকে
রাখিত তোমার জন্যে ! নীর-বিন্দু যত
দেখিতে কুসুমদলে, হে সুধাংশু-নিধি ৯৫
অভাগীর অশ্রুবিন্দু—কহিনু তোমারে !
কত যে কহিত তারা,—হায় পাগলিনী !—
প্রতি ফুলে, কেমনে তা আনিব এ মুখে ?
কহিত সে চম্পকেরে,—"বর্ণ তোর হেরি,
রে ফুল, সাদরে তোরে তুলিবেন যবে ১০০
ও কর-কমলে, সখা, কহিস্ তাঁহারে,—
'এ বর বরণ মম কালি অভিমানে
হেরি যে বর বরণ, হে রোহিণীপতি,
কালি সে বর বরণ তোমার বিহনে !'
কহিত সে কদম্বেরে,—না পারি কহিতে ১০৫
কি যে সে কহিত তারে, হে সোম, শরমে !—
রসের সাগর তুমি, ভাবি দেখ মনে !

শুনি লোকমুখে, সখে, চন্দ্রলোকে তুমি
ধর মৃগশিশু কোলে, কত মৃগশিশু
ধরেছি যে কোলে আমি কাঁদিয়া বিরলে, ১১০

কি আর কহিব তার? শুনিলে হাসিবে,
হে সুহাসি! নাহি জ্ঞান; না জানি কি লিখি!
    ফাটিত এ পোড়া প্রাণ হেরি তারাদলে!
ডাকিতাম মেঘদলে চির আবরিতে
রোহিণীর স্বর্ণকান্তি। ভ্রান্তিমদে মাতি, ১১৫
সপত্নী বলিয়া তারে গঞ্জিতাম রোষে!
প্রফুল্ল কুমুদে হ্রদে হেরি নিশাযোগে
তুলি ছিঁড়িতাম রাগে;—আঁধার কুটীরে
পশিতাম বেগে হেরি সরসীর পাশে
তোমায়! ভূতলে পড়ি, তিতি অশ্রুজলে, ১২০
কহিতাম অভিমানে,—'রে দারুণ বিধি,
নাহি কি যৌবন মোর,—রূপের মাধুরী?
তবে কেন,—'কিন্তু বৃথা স্মরি পূর্ব্বকথা!
নিবেদিব, দেবশ্রেষ্ঠ, দিন দেহ যবে!
    তুষেছ গুরুর মনঃ সুদক্ষিণা-দানে; ১২৫
গুরুপত্নী চাহে ভিক্ষা,—দেহ ভিক্ষা তারে!
দেহ ভিক্ষা ছায়ারূপে থাকি তব সাথে
দিবানিশি! দিবানিশি সেবি দাসীভাবে
ও পদযুগল, নাথ,—হা ধিক্, কি পাপে,
হায় রে, কি পাপে, বিধি, এ তাপ লিখিলি ১৩০
এ ভালে? জনম মম মহা ঋষিকুলে,
তবু চণ্ডালিনী আমি? ফলিল কি এবে
পরিমলাকর ফুলে, হায়, হলাহল?
কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি গোপনে
কাকশিশু? কর্ম্মনাশা—পাপ-প্রবাহিণী!— ১৩৫
কেমনে পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে?
    ক্ষম, সখে! পোষা পাখী, পিঞ্জর খুলিলে,
চাহে পুনঃ পশিবারে পূর্ব্ব কারাগারে!
এস তুমি; এস শীঘ্র! যাব কুঞ্জ-বনে,
তুমি, হে বিহঙ্গরাজ, তুমি সঙ্গে নিলে! ১৪০

দেহ পদাশ্রয় আসি,—প্রেম-উদাসিনী
আমি! যথা যাও যাব ; করিব যা কর ;—
বিকাইব কায় মনঃ তব রাঙা পায়ে!
কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্ব্ব জনে।
কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে, ১৪৫
তারানাথ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।
এস, হে তারার বাঞ্ছা! পোড়ে বিরহিণী,
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে!
চকোরী সেবিলে তোমা দেহ সুধা তারে,
সুধাময় ; কোন্ দোষে দোষী তব পদে ১৫০
অভাগিনী? কুমুদিনী কোন্ তপোবলে
পায় তোমা নিত্য, কহ? আরম্ভি সত্বরে
সে তপঃ আহার নিদ্রা ত্যজি একাসনে!
কিন্তু যদি থাকে দয়া এস শীঘ্র করি!
এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে ১৫৫
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়া
সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা, মণি!
আর কি লিখিবে দাসী? সুপণ্ডিত তুমি,
ক্ষম ভ্রম ; ক্ষম দোষ! কেমনে পড়িব
কি কহিল পোড়া মনঃ, হায়, কি লিখিল ১৬০
লেখনী? আইস, নাথ, এ মিনতি পদে।
লিখিনু লেখন বসি একাকিনী বনে,
কাঁপি ভয়ে—কাঁদি খেদে—মরিয়া শরমে!
লয়ে ফুলবৃন্ত, কান্ত, নয়ন-কাজলে
লিখিনু! ক্ষমিও দোষ, দয়াসিন্ধু তুমি! ১৬৫
আইলে দাসীর পাশে, বুঝিব ক্ষমিলে
দোষ তার, তারকনাথ! কি আর কহিব?
জীবন মরণ মম আজি তব হাতে! ১৬৮

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা কাব্যে তারাপত্রিকা নাম
দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী

[বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মকরাজপুত্রী রুক্মিণী দেবীকে পৌরাণিক ইতিবৃত্তে স্বয়ং লক্ষ্মী-অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি আজন্ম বিষ্ণুপরায়ণা ছিলেন। যৌবনাবস্থায় তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ রুক্ম চেদীশ্বর শিশুপালের সহিত তাঁহার পরিণয়ার্থে উদ্যোগী হইলে, রুক্মিণী দেবী নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি দ্বারকায় বিষ্ণু-অবতার দ্বারকানাথের সমীপে প্রেরণ করেন। রুক্মিণী-হরণ-বৃত্তান্ত এ স্থলে ব্যক্ত করা বাহুল্য।]

শুনি নিত্য ঋষিমুখে, ঋষিকেশ তুমি,
যাদবেন্দ্র, অবতীর্ণ অবনী-মণ্ডলে
খণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাপী-জনে,
চাহে পদাশ্রয়, নমি ও রাজীব-পদে,
রুক্মিণী,—ভীষ্মক-পুত্রী, চিরদাসী তব ;— ৫
তার, হে তারক, তারে এ বিপত্তি-কালে!
কেমনে মনের কথা কহিব চরণে,
অবলা কুলের বালা আমি, যদুমণি?
কি সাহসে বাঁধি বুক, দিব জলাঞ্জলি
লজ্জাভয়ে? মুদে আঁখি, হে দেব, শরমে, ১০
না পারে আঙুল-কুল ধরিতে লেখনী ;
কাঁপে হিয়া থরথরে! না জানি কি করি ;
না জানি কাহারে কহি এ দুঃখ-কাহিনী!
শুন তুমি, দয়াসিন্ধু! হায়, তোমা বিনা
নাহি গতি অভাগীর আর এ সংসারে! ১৫
নিশার স্বপনে হেরি পুরুষ-রতনে,
কায় মনঃ অভাগিনী সঁপিয়াছে তাঁরে ;
দেবে সাক্ষী করি বরি দেবনরোত্তমে
বরভাবে ; নারী দাসী, নারে উচ্চারিতে
নাম তাঁর, স্বামী তিনি ; কিন্তু কহি, শুন, ২০

পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ জপেন সতত
সে নাম,—জগত-কর্ণে সুধার লহরী!
কে যে তিনি? জন্ম তাঁর কোন্ মহাকুলে?
অবধান কর, প্রভু, কহিব সংক্ষেপে;
তুলিয়া কুসুম-রাশি, মালিনী যেমতি ২৫
গাঁথে মালা, ঋষিমুখ-বাক্যচয় আজি
গাঁথিব গাথায়, নাথ, দেহ পদ-ছায়া।
গৃহিলা পুরুষোত্তম জন্ম কারাগারে।—
রাজদ্বেষে পিতা মাতা ছিলা বন্দীভাবে,
দীনবন্ধু, তেঁই জন্ম নাথের কুস্থলে! ৩০
খনিগর্ভে ফলে মণি; মুক্তা শুক্তিধামে!
হাসিলা উল্লাসে পৃথ্বী সে শুভ নিশীথে;
শত শরদের শশী-সদৃশী শোভিল
বিভা! গন্ধামোদে মাতি স্বনিলা সুস্বনে
সমীরণ; নদ নদী কলকলকলে ৩৫
সিন্ধুপদে সুসংবাদ দিলা দ্রুতগতি;
কল্লোলিলা জলপতি গম্ভীর নিনাদে!
নাচিলা অপ্সরা স্বর্গে; মর্ত্ত্যে নর নারী!
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে বহিল চৌদিকে!
বৃষ্টিলা কুসুম দেব; পাইল দরিদ্র ৪০
রতন; জীবন পুনঃ জীবশূন্য জন!
পূরিল আখিল বিশ্ব জয় জয় রবে।
জন্মান্তে জনমদাতা, ঘোর নিশাযোগে,
গোপরাজ-গৃহে লয়ে রাখিলা নন্দনে
মহা যত্নে। মহারত্নে পাইলে যেমতি ৪৫
আনন্দ সলিলে ভাসে দরিদ্র, ভাসিলা
গোকুলে গোপ-দম্পতি আনন্দ-সলিলে!
আদরে পালিলা বালে গোপ-কুল-রাণী
পুত্রভাবে। বাল্য-কালে বাল্য খেলা যত
খেলিলা রাখাল-রাজ কে পারে বর্ণিতে? ৫০

কে কবে, কি ছলে শিশু নাশিলা মায়াবী
পূতনারে? কাল নাগ কালীয়, কি দেখি,
লইল আশ্রয় নমি পাদ-পদ্ম-তলে?
কে কবে, বাসব যবে রুষি, বরষিলা
জলসার, কি কৌশলে গোবর্দ্ধনে তুলি, ৫৫
রক্ষিলা গোকুল, দেব, প্রলয়-প্লাবনে?
আর আর কীর্ত্তি যত বিদিত জগতে?
যৌবনে করিলা কেলি গোপী-দলে লয়ে
রসরাজ; মজাইলা গোপ-বধূ-ব্রজ
বাজায়ে বাঁশরী, নাচি তমালের তলে! ৬০
বিহারিলা গোষ্ঠে প্রভু; যমুনা-পুলিনে!
এইরূপে কত কাল কাটাইলা সুখে
গোপ-ধামে গুণনিধি; পরে বিনাশিয়া
পিতৃ-অরি অরিন্দম, দূর সিন্ধু-তীরে
স্থাপিলা সুন্দরী পুরী। আর কব কত? ৬৫
দেখ চিন্তি, চিন্তামণি, চেন যদি তারে!
না পার চিনিতে যদি, দেহ আজ্ঞা তবে,
পীতাম্বর, দেখি যদি পারে হে বর্ণিতে
সে রূপ-মাধুরী দাসী। চিত্রপটে যেন,
চিত্রিত সে মূর্ত্তি চির, হায়, এ হৃদয়ে! ৭০
নবীন-নীরদ-বর্ণ; শিখি-পুচ্ছ শিরে;
ত্রিভঙ্গ; সুগল-দেশে বরগুঞ্জমালা;
মধুর অধরে বাঁশী; বাস পীত ধড়া;
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন রাজীব-চরণে—
যোগীন্দ্র-মানস-পদ্ম! মোক্ষ-ধাম ভবে! ৭৫
যত বার হেরি, দেব, আকাশ মণ্ডলে,
ঘনবরে, শক্র-ধনুঃ চূড়ারূপে শিরে;
তড়িৎ সুধড়া অঙ্গে;—পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া,
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি, আমি পূজি ভক্তি-ভাবে!
ভ্রান্তিমদে মাতি কহি,—'প্রাণকান্ত মম ৮০

আসিছেন শূন্যপথে তুষিতে দাসীরে !
উড়ে যদি চাতকিনী, গঞ্জি তারে রাগে !
নাচিলে ময়ূরী, তারে মারি, যদুমণি !
মন্দ্রে যদি ঘনবর, ভাবি, আঁখি মুদি,
গোপ-কুল-বালা আমি ; বেণুর স্বরবে ৮৫
ডাকিছেন সখা মোর যমুনা-পুলিনে !
কহি শিখীবরে,—'ধন্য তুই পক্ষিকুলে,
শিখণ্ডি ! শিখণ্ড তোর মণ্ডে শিরঃ যাঁর,
পূজেন চরণ তাঁর আপনি ধূর্জ্জটি !'—
আর পরিচয় কত দিব পদযুগে ? ৯০
শুন এবে দুঃখ-কথা। হৃদয় মন্দিরে
স্থাপি সে সুশ্যাম মূর্ত্তি, সন্ন্যাসিনী যথা
পূজে নিত্য ইষ্টদেবে গহন বিপিনে,
পূজিতাম আমি নাথে। এবে ভাগ্য দোষে
চেদীশ্বর নরপাল শিশুপাল নামে, ৯৫
(শুনি জনরব) নাকি আসিছেন হেথা
বরবেশে বরিবারে, হায় অভাগীরে !
কি লজ্জা ! ভাবিয়া দেখ হে দ্বারকাপতি !
কেমনে অধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে রুক্মিণী ?
স্বেচ্ছায় দিয়াছে দাসী, হায়, এক জনে ১০০
কায় মনঃ ; অন্য জনে—ক্ষম, গুণনিধি !
উড়ে প্রাণ, পোড়া কথা পড়ে যবে মনে !
কি পাপে লিখিলা বিধি এ যাতনা ভালে ?
আইস গরুড়-ধ্বজে, পাঞ্চজন্য নাদি,
গদাধর ! রূপ গুণ থাকিত যদ্যপি ১০৫
এ দাসীর,—কহিতাম, 'আইস, মুরারী,
আইস ; বাহন তব বৈনতেয় যথা
হরিল অমৃতরস পশি চন্দ্রলোকে,
হর অভাগীরে তুমি প্রবেশি এ দেশে !'
কিন্তু নাহি রূপ গুণ ; কোন্ মুখ দিয়া ১১০

অমৃতের সহ দিব আপন তুলনা!
দীন আমি ; দীনবন্ধু তুমি, যদুপতি ;
দেহ লয়ে রুক্মিণীরে সে পুরুষোত্তমে,
যাঁর দাসী করি বিধি সৃজিলা তাহারে!
রুক্ম নামে সহোদর,—দুরন্ত সে অতি ; ১১৫
বড় প্রিয়পাত্র তার চেদীশ্বর বলী ;
শরমে মায়ের পদে নারি নিবেদিতে
এ পোড়া মনের কথা! চন্দ্রকলা সখী,
তার গলা ধরি, দেব, কাঁদি দিবানিশি ;—
নীরবে দুজনে কাঁদি সভয়ে বিরলে! ১২০
লইনু শরণ আজি ও রাজীব-পদে ;—
বিঘ্ন-বিনাশন তুমি, ত্রাণ বিঘ্নে মোরে!
কি ছলে ভুলাই মনঃ ; কেমনে যে ধরি
ধৈরয, শুনিবে যদি, কহিব, শ্রীপতি!
বহে প্রবাহিণী এক রাজ বন-মাঝে ; ১২৫
'যমুনা' বলিয়া তারে সম্বোধি আদরে,
গুণনিধি! কূলে তার কত যে রোপেছি
তমাল, কদম্ব,—তুমি হাসিবে শুনিলে!
পুষিয়াছি সারী শুক, ময়ূর ময়ূরী
কুঞ্জবনে ; অলিকুল গুঞ্জরে সতত ; ১৩০
কুহরে কোকিল ডালে ; ফোটে ফুলরাজী।
কিন্তু শোভাহীন বন প্রভুর বিহনে!
কহ কুঞ্জবিহারীরে, হে দ্বারকাপতি,
আসিতে সে কুঞ্জবনে বেণু বাজাইয়া!
কিম্বা মোরে লয়ে, দেব, দেহ তাঁর পদে! ১৩৫
আছে বহু গাভী গোষ্ঠে ; নিজ কর দিয়া
সেবে দাসী তা সবারে। কহ হে রাখালে
আসিতে সে গোষ্ঠগৃহে, কহ, যদুমণি!
যতনে চিকণি নিত্য গাঁথি ফুলমালা ;
যতনে কুড়ায়ে রাখি যদি পাই পড়ি ১৪০

শিখীপুচ্ছ ভূমিতলে ;—কত যে কি করি,
হায়, পাগলিনী আমি! কি কাজ কহিয়া?
আসি উদ্ধারহ মোরে, ধনুর্দ্ধর তুমি,
মুরারি! নাশিলা কংসে, শুনিয়াছে দাসী,
কংসজিত ; মধু নামে দৈত্য-কুল-রথী, ১৪৫
বধিলা, মধুসূদন, হেলায় তাহারে!
কে বর্ণিবে গুণ তব গুণনিধি তুমি?
কালরূপে শিশুপাল আসিছে সত্বরে ;
আইস তাহার অগ্রে। প্রবেশি এ দেশে,
হর মোরে! হরে লয়ে দেহ তাঁর পদে, ১৫০
হরিলা এ মনঃ যিনি নিশার স্বপনে!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে রুক্মিণীপত্রিকা নাম
তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

দশরথের প্রতি কেকয়ী

[কোন সময়ে রাজর্ষি দশরথ কেকয়ী দেবীর নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার গর্ভজাত-পুত্র ভরতকেই যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। কালক্রমে রাজা স্বসত্য বিস্মৃত হইয়া কৌশল্যানন্দন রামচন্দ্রকে সে পদ-প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে কেকয়ী দেবী মন্থরানাম্নী দাসীর মুখে এ সংবাদ পাইয়া, নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে
রঘুরাজ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে!
কহ তুমি;—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন? ছড়াইছে কেহ ৫
ফুলরাশি রাজপথে; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল কুসুম ফল পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী ১০
বাহিরিছে রণবেশে? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য? কেন আজি পুরনারী-ব্রজ
মুহুর্মুহু হুলাহলি দিতেছে চৌদিকে?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়কী?
কেন এত বীণা-ধ্বনি? কহ, দেব, শুনি, ১৫
কৃপা করি কহ মোরে,—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘু-কুল-শ্রেষ্ঠ? কহ, হে নৃমণি,
কাহার কুশল-হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেন ধন-জাল? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ, ঘণ্টা ঘটারোলে? ২০
কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে?

নিরন্তর জন-স্রোতঃ কেন বা বহিছে
এ নগর অভিমুখে? রঘু-কুল বধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
কোন্ রঙ্গে? অকালে কি আরম্ভিলা, প্রভু, ২৫
যজ্ঞ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘু-কুল রথি?
জন্মিল কি পুত্র আর? কাহার বিবাহ
দিবে আজি? আইবড় আছে কি হে গৃহে
দুহিতা? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে! ৩০
কহ, শুনি, হে রাজন্; এ বয়েসে পুনঃ
পাইলা কি ভাগ্য-বলে—ভাগ্যবান্ তুমি
চিরকাল!—পাইলা কি পুনঃ এ বয়েসে—
রসময়ীনারী-ধনে, কহ, রাজ-ঋষি?

হা ধিক্! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি! ৩৫
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত, 'অসত্য বাদী রঘু-কুল-পতি!
নির্লজ্জ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে!
ধর্ম্ম শব্দ মুখে, গতি অধর্ম্মের পথে!'

অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে ৪০
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি,
নররাজ; কিম্বা দিয়া চূণ কালি গালে
খেদাও গহন বনে! যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে ভুঞ্জিবে
এ কলঙ্ক? লোক-মাঝে কেমনে দেখাবে ৪৫
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে।

না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভরে!
নহে গুরু উরু-দ্বয়, বর্ত্তুল কদলী-
সদৃশ। সে কটি, হায়, কর-পদ্মে ধরি
যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে, ৫০
আর নহে সরু, দেব! নম্র-শিরঃ এবে

উচ্চ কুচ! সুধা-হীন অধর! লইল
লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন-ভাণ্ডারে
আছিল রতন যত; হরিল কাননে
নিদাঘ কুসুম-কান্তি, নীরসি কুসুমে! ৫৫

কিন্তু পূর্ব্বকথা এবে স্মর, নরমণি!—
সেবিনু চরণ যবে তরুণ যৌবনে,
কি সত্য করিলা প্রভু, ধর্ম্মে সাক্ষী করি,
মোর কাছে? কাম-মদে মাতি যদি তুমি
বৃথা আশা দিয়া মোরে ছলিলা, তা কহ;— ৬০
নীরবে এ দুঃখ আমি সহিব তা হলে!
কামীর কুরীতি এই শুনেছি জগতে,
অবলার মনঃ চুরি করে সে সতত
কৌশলে, নির্ভয়ে ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি;—
প্রবঞ্চনা-রূপ ভস্ম মাখে মধুরসে ৬৫
এ কুপথে পথী কি হে সূর্য্য-বংশ-পতি?
তুমিও কলঙ্ক-রেখা লেখ স্বললাটে,
(শশাঙ্ক-সদৃশ) এবে, দেব দিনমণি!
ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেব নর,—জিতেন্দ্রিয়, নিত্য সত্যপ্রিয়! ৭০
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে? কোথা পুত্র তব
ভরত,—ভারত-রত্ন, রঘু-চূড়ামণি?
পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব্বকথা যত? ৭৫
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী?

তিন রাণী তব রাজা! এ তিনের মাঝে,
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে? পুত্র তব চারি, নরমণি! ৮০
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে?

কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা মহিষী
ভুলাইয়া মনঃ তব? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার, রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি? ৮৫
কিন্তু বাক্য-ব্যয় আর কেন অকারণে?—
যাহা ইচ্ছা কর, দেব; কার সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি? কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে? বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে!
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ-পুরী ৯০
ভিখারিণী-বেশে দাসী! দেশ দেশান্তরে
ফিরিব; যেখানে যাব, কহিব সেখানে
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্ব্বজনে! ৯৫
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
পুষি সারী শুক, দোঁহে শিখাব যতনে
এ মোর দুঃখের কথা, দিবস রজনী ১০০
শিখিলে এ কথা, তবে দিব দোঁহে ছাড়ি
অরণ্যে। গাইবে তারা বসি বৃক্ষ শাখে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
শিখি পক্ষীমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!' ১০৫
লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গ শৃঙ্গদেহে।
রচি গাথা, শিখাইব পল্লী-বাল-দলে।
করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া— ১১০
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'

থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল! দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিব আজি; দেখিব নয়নে
তব আশা-বৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি? ১১৫

বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি। বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,
(এত যে বয়েস, তবু লজ্জাহীন তুমি!)
যুবরাজ পুত্র রাম; জনক-নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ;—এ সবারে লয়ে ১২০
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি!

পিতৃ-মাতৃ হীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি।
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন; প্রবেশিতে তব পাপ-পুরে। ১২৫

চিরি বক্ষঃ মনোদুঃখে লিখিনু শোণিতে
লেখন। না থাকে যদি পাপ এ শরীরে;
পতি-পদ-গতা যদি পতিব্রতা দাসী;
বিচার করুন ধর্ম্ম ধর্ম্ম-রীতি-মতে!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে কেকয়ীপত্রিকা নাম
চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ

লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা

[যৎকালে শ্রীরামচন্দ্র পঞ্চবটী-বনে বাস করেন, লঙ্কাধিপতি রাবনের ভগিনী শূর্পণখা রামানুজের মোহন-রূপে মুগ্ধা হইয়া তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। কবিগুরু বাল্মীকি রাজেন্দ্র রাবণের পরিবারবর্গকে প্রায়ই বীভৎস রস দিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এ স্থলে সে রসের লেশ মাত্রও নাই। অতএব পাঠকবর্গ সেই বাল্মীকিবর্ণিতা বিকটা শূর্পণখাকে স্মরণপথ হইতে দূরীকৃতা করিবেন।]

কে তুমি,—বিজন বনে ভ্রম হে একাকী,
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ? কি কৌতুকে, কহ,
বৈশ্বানর, লুকাইছ ভস্মের মাঝারে?
মেঘের আড়ালে যেন পূর্ণশশী আজি?
ফাটে বুক জটাজূট হেরি তব শিরে, ৫
মঞ্জুকেশি! স্বর্ণশয্যা ত্যজি লাগি আমি
বিরাগে, যখন ভাবি, নিত্য নিশাযোগে
শয়ন, বরাঙ্গ তব, হায় রে, ভূতলে!
উপাদেয় রাজ-ভোগ যোগাইলে দাসী,
কাঁদি ফিরাইয়া মুখ, পড়ে যবে মনে ১০
তোমার আহার নিত্য ফল মূল, বলি!
সুবর্ণ-মন্দিরে পশি নিরানন্দ গতি,
কেন না—নিবাস তব বঞ্জুল মঞ্জুলে!
হে সুন্দর, শীঘ্র আসি কহ মোরে শুনি,—
কোন্ দুঃখে ভব সুখে বিমুখ হইলা ১৫
এ নব যৌবনে তুমি? কোন্ অভিমানে
রাজবেশ ত্যজিলা হে উদাসীর বেশে?
হেমাঙ্গ মৈনাক সম, হে তেজস্বি, কহ,
কার ভয়ে ভ্রম তুমি এ বন-সাগরে
একাকী, আবরি তেজঃ, ক্ষীণ, ক্ষুণ্ণ খেদে? ২০
তোমার মনের কথা কহ আসি মোরে!—
যদি পরাভূত তুমি রিপুর বিক্রমে,
কহ শীঘ্র; দিব সেনা ভব বিজয়িনী,

রথ, গজ, অশ্ব, রথী—অতুল জগতে!
বৈজয়ন্ত-ধামে নিত্য শচীকান্ত বলী ২৫
ত্রস্ত অস্ত্র-ভয়ে যার, হেন ভীম রথী
যুঝিবে তোমার হেতু—আমি আদেশিলে!
চন্দ্রলোকে, সূর্য্যলোকে,—যে লোকে ত্রিলোকে
লুকাইবে অরি তব, বাঁধি আমি তারে
দিব তব পদে, শূর! চামুণ্ডা আপনি, ৩০
(ইচ্ছা যদি কর তুমি) দাসীর সাধনে,
(কুলদেবী তিনি, দেব,) ভীমখণ্ডা হাতে,
ধাইবেন হুহুঙ্কারে নাচিতে সংগ্রামে—
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস!—যদি অর্থ চাহ,
কহ শীঘ্র;—অলকার ভাণ্ডার খুলিব ৩৫
তুষিতে তোমার মনঃ; নতুবা কুহকে
শুষি রত্নাকরে, লুটি দিব রত্ন জালে!
মণিযোনি খনি যত, দিব হে তোমারে।
প্রেম-উদাসীন, যদি তুমি, গুণমণি,
কহ, কোন্ যুবতীর—(আহা, ভাগ্যবতী ৪০
রামাকুলে সে রমণী!)—কহ শীঘ্র করি,—
কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু
বাঞ্ছা তব? অনিমেষে রূপ তার ধরি,
(কামরূপা আমি, নাথ) সেবিব তোমারে!
(আনি পারিজাত ফুল, নিত্য সাজাইব ৪৫
শয্যা তব! সঙ্গে মোর সহস্র সঙ্গিনী,
নৃত্য গীত রঙ্গে রত। অপ্সরা, কিন্নরী,
বিদ্যাধরী,—ইন্দ্রাণীর কিঙ্করী যেমতি,
তেমতি আমারে সেবে দশ শত দাসী।
সুবর্ণ-নির্ম্মিত গৃহে আমার বসতি— ৫০
মুক্তাময় মাঝ তার; সোপান খচিত
মরকতে; স্তম্ভে হীরা; পদ্মরাগ মণি;
গবাক্ষে দ্বিরদ রদ, রতন কপাটে!

সুকল স্বরলহরী উথলে চৌদিকে
দিবানিশি ; গায় পাখী সুমধুর স্বরে ; ৫৫
সুমধুরতর স্বরে গায় বীণাপাণী
বামাকুল ! শত শত কুসুম-কাননে
লুটি পরিমল, বায়ু অনুক্ষণ বহে !
খেলে উৎস ; চলে জল কলকল কলে !
কিন্তু বৃথা এ বর্ণনা। এস, গুণনিধি, ৬০
দেখ আসি,—এ মিনতি দাসীর ও পদে !
কায়, মনঃ, প্রাণ আমি সপিব তোমারে।
ভুঞ্জ আসি রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে ;
নহে কহ, প্রাণেশ্বর ! অম্লান বদনে,
এ বেশ ভূষণ ত্যজি, উদাসিনী-বেশে ৬৫
সাজি, পূজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব !
রতন কাঁচলি খুলি, ফেলি তারে দূরে,
আবরি বাকলে স্তন ; ঘুচাইয়া বেণী,
মণ্ডি জটাজূটে শিরঃ ভুলি রত্নরাজী,
বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি হে কবরী ! ৭০
মুছিয়া চন্দন, লেপি ভস্ম কলেবরে।
পরি রুদ্রাক্ষের মালা, মুক্তামালা ছিঁড়ি
গলদেশে ! প্রেম-মন্ত্র দিও কর্ণ-মূলে ;
গুরুর দক্ষিণা-রূপে প্রেম গুরু-পদে
দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতূহলে ! ৭৫
প্রেমাধীনা নারীকুল ডরে কি হে দিতে
জলাঞ্জলি, মঞ্জুকেশি, কুল, মান, ধনে
প্রেম লাভ লোভে কভু ?—বিরলে লিখিয়া
লেখন, রাখিনু সখে, এই তরুতলে।
নিত্য তোমা হেরি হেথা ; নিত্য ভ্রম তুমি ৮০
এই স্থলে। দেখ চেয়ে, ওই যে শোভিছে
শমী, লতাবৃতা, মরি ঘোমটায় যেন,
লজ্জাবতী !—দাঁড়াইয়া উহার আড়ালে,

গতিহীনা লজ্জাভয়ে, কত যে চেয়েছি
তব পানে, নরবর—হায়! সূর্য্যমুখী ৮৫
চাহে যথা স্থির-আঁখি সে সূর্য্যের পানে!—
কি আর কহিব তার? যত ক্ষণ তুমি
থাকিতে বসিয়া, নাথ, থাকিত দাঁড়ায়ে
প্রেমের নিগড়ে বদ্ধা এ তোমার দাসী!
গেলে তুমি শূন্যাসনে বসিতাম কাঁদি! ৯০
হায় রে, লইয়া ধূলা, সে স্থল হইতে
যথায় রাখিতে পদ, মাখিতাম ভালে,
হব্য-ভস্ম তপস্বিনী মাখে ভালে যথা!
কিন্তু বৃথা কহি কথা! পড়িও, নৃমণি,
পড়িও এ লিপিখানি, এ মিনতি পদে! ৯৫
যদি ও হৃদয়ে দয়া উদয়ে, যাইও
গোদাবরী-পূর্ব্বকূলে; বসিব সেখানে
মুদিত কুমুদীরূপে আজি সায়ংকালে;
তুষিও দাসীরে আসি শশধর-বেশে!
লয়ে তরি সহচরী থাকিবেক তীরে; ১০০
সহজে হইবে পার। নিবিড় সে পারে
কানন বিজন, দেশ। এস, গুণনিধি,
দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি হে দুজনে!
যদি আজ্ঞা দেহ, এবে পরিচয় দিব
সংক্ষেপে। বিখ্যাত, নাথ, লঙ্কা, রক্ষঃপুরী ১০৫
স্বর্ণময়ী, রাজা তথা রাজ-কুল-পতি
রাবণ, ভগিনী তাঁর দাসী; লোকমুখে
যদি না শুনিয়া থাক, নাম শূর্পণখা
কত যে বয়েস তার; কি রূপ বিধাতা
দিয়াছেন, আশু আসি দেখ, নরমণি! ১১০
আইস মলয়-রূপে; গন্ধহীন যদি
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইও তখনি!
আইস ভ্রমর-রূপে; না যোগায় যদি

মধু এ যৌবন-ফুল, যাইও উড়িয়া
গুঞ্জরি বিরাগ-রাগে! কি আর কহিব? ১১৫
মলয় ভ্রমর, দেব, আসি সাধে দোহে
বৃন্তাসনে মালতীরে! এস, সখে, তুমি;—
এই নিবেদন করে শূর্পণখা পদে।

শুন নিবেদন পুনঃ। এত দূর লিখি
লেখন, সখীর মুখে শুনিনু হরষে; ১২০
রাজরথী দশরথ অযোধ্যাধিপতি,
পুত্র তুমি, হে কন্দর্প গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারি,
তাঁহার; অগ্রজ সহ পশিয়াছ বনে
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু। কি আশ্চর্য্য! মরি,—
বালাই লইয়া তব, মরি, রঘুমণি, ১২৫
দয়ার সাগর তুমি! তা না হলে কভু
রাজ্য-ভোগ ত্যজিতে কি ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে?
দয়ার সাগর তুমি! কর দয়া মোরে,
প্রেম-ভিখারিণী আমি তোমার চরণে!
চল শীঘ্র যাই দোঁহে স্বর্ণ লঙ্কাধামে ১৩০
সম পাত্র মানি তোমা, পরম আদরে,
অর্পিবেন শুভ ক্ষণে রক্ষঃকুল পতি
দাসীরে কমল-পদে। কিনিয়া, নৃমণি,
অযোধ্যা-সদৃশ রাজ্য শতেক যৌতুকে,
হবে রাজা; দাসী-ভাবে সেবিবে এ দাসী। ১৩৫
এস শীঘ্র, প্রাণেশ্বর; আর কথা যত
নিবেদিব পাদ-পদ্মে বসিয়া বিরলে।

ক্ষম অশ্রু-চিহ্ন পত্রে; আনন্দে বহিছে
অশ্রুধারা! লিখেছে কি বিধাতা এ ভালে
হেন সুখ, প্রাণসখে? আসি ত্বরা করি, ১৪০
প্রশ্নের উত্তর, নাথ, দেহ এ দাসীরে।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে শূর্পণখা পত্রিকা নাম
পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ

অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী

[যৎকালে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাশাক্রীড়ায় পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া বনে বাস করেন, বীরবর অর্জ্জুন বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত অস্ত্রশিক্ষার্থ সুরপুরে গমন করিয়াছিলেন। পার্থের বিরহে কাতর হইয়া, দ্রৌপদী দেবী তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি এক ঋষিপুত্রের সহযোগে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

হে ত্রিদশালয়-বাসি, পড়ে কভু মনে
এ পাপ সংসার আর? কেন বা পড়িবে?
কি অভাব তব, কান্ত, বৈজয়ন্ত-ধামে?
দেব-ভোগ-ভোগী তুমি, দেবসভা মাঝে
আসীন দেবেন্দ্রাসনে! সতত আদরে ৫
সেবে তোমা সুরবালা,—পীনপয়োধরা
ঘৃতাচী; সু-উরু-রম্ভা; নিত্য-প্রভাময়ী
স্বয়ম্প্রভা; মিশ্রকেশী—সুকেশিনী ধনী!
উর্ব্বশী—কলঙ্ক-হীনা শশিকলা দিবে!
নিবিড় নিতম্বী সহা সহ চিত্রলেখা ১০
চারুনেত্রা; সুমধ্যমা তিলোত্তমা বামা;
সুলোচনা সুলোচনা; কেহ গায় সুখে!
কেহ নাচে,—দিব্য বীণা বাজে দিব্য তালে;
মন্দার-মণ্ডিত বেণী দোলে পৃষ্ঠদেশে!
কস্তুরী কেশর ফুল আনে কেহ সাথে। ১৫
কেহ বা অধর-মধু যোগায় বিরলে,
সুমৃণাল ভুজে তোমা বাঁধি, গুণনিধি!
রসিক নাগর তুমি! নিত্য রসবতী
সুরবালা;—শত ফুল প্রফুল্ল যে বনে,
কি সুখে বঞ্চিত, সখে, শিলীমুখ তথা? ২০
নন্দন কাননে তুমি আনন্দে, সুমতি,
ভ্রম নিত্য! শুনিয়াছি ঋতুরাজ না কি

সাজান সে বনরাজি বিরাজে সে বনে
নিরন্তর ; নিরন্তর গায় পাখী শাখে ;
না শুখায় ফুলকুল ; মণি মুক্তা হীরা ২৫
স্বর্ণ মরকতে বাঁধা সরোরোধঃ যত !
মন্দ মন্দ সমীরণ বহে দিবা নিশি
গন্ধামোদে পূরি দেশ ! কিন্তু এ বর্ণনে
কি কাজ ? শুনেছে দাসী কর্ণে মাত্র যাহা,
নিত্য স্বনয়নে তুমি দেখ তা, নৃমণি ! ৩০
স্বশরীরে স্বর্গভোগ ! কার ভাগ্য হেন
তোমা বিনা, ভাগ্যবান্ এ ভব মণ্ডলে ?
ধন্য নর-কুলে তুমি ! ধন্য পুণ্য তব !

পড়িলে এ সব কথা মনে, শূরমণি,
কেমনে ভাবিব হায়, কহ তা আমারে, ৩৫
অভাগী দাসীর কথা পড়ে তব মনে ?
তবে যদি নিজগুণে, গুণনিধি তুমি,
ভুলিয়া না থাক তারে,—আশীর্ব্বাদ কর,
নমে পদে, ধনঞ্জয়, দ্রুপদ-নন্দিনী—
কৃতাঞ্জলি-পুটে দাসী নমে তব পদে ! ৪০
হায়, নাথ, বৃথা জন্ম নারীকুলে মম !
কেন যে লিখিলা বিধি এ পোড়া কপালে
হেন তাপ ; কোন্ পাপে দণ্ডিলা দাসীরে
এরূপে, কে কবে মোরে ? সুধিব কাহারে ?
রবি পরায়ণা, মরি, সরোজিনী ধনী, ৪৫
তবু নিত্য সমীরণ কহে তার কানে
প্রেমের রহস্য কথা ! অবিরল লুটে
পরিমল ! শিলীমুখ, গুঞ্জরি সতত,
(কি-লজ্জা !) অধর-মধু পান করে সুখে !
সৃজিলা কমলে যিনি, সৃজিলা দাসীরে ৫০
সেই নিদারুণ বিধি ! কারে নিন্দি, কহ,
অরিন্দম ? কিন্তু কহি ধর্ম্মে সাক্ষী মানি,

শুন তুমি, প্রাণকান্ত! রবির বিরহে,
নলিনী মলিনী যথা মুদ্রিত বিষাদে;
মুদিত এ পোড়া প্রাণ তোমার বিহনে! ৫৫
সাধে যদি শত কলি গুঞ্জরিয়া পদে;
সহস্র মিনতি যদি করে কর্ণ-মূলে
সমীরণ, ফোটে কি হে কভু পঙ্কজিনী,
কনক-উদয়াচলে না হেরি মিহিরে,
কিরীটি? আঁধার বিশ্ব এ পোড়া নয়নে, ৬০
হায় রে, আঁধার নাথ, তোমার বিরহে—
জীবশূন্য, রবশূন্য, মহারণ্য যেন!
আর কি কহিব, দেব, ও রাজীব-পদে?
পাঞ্চালীর চির-বাঞ্ছা, পাঞ্চালীর পতি
ধনঞ্জয়! এই জানি, এই মানি মনে। ৬৫
যা ইচ্ছা করুন ধর্ম্ম, পাপ করি যদি
ভালবাসি নৃমণিরে,—যা ইচ্ছা, নৃমণি!
হেন সুখ ভুঞ্জি, দুঃখ কে ডরে ভুঞ্জিতে?
    যজ্ঞানলে জনমিল দাসী যাজ্ঞসেনী,
জান তুমি, মহাযশা। তরুণ যৌবনে ৭০
রূপ গুণ যশে তব, হায় রে বিবশা,
বরিনু তোমায় মনে! সখীদলে লয়ে
কত যে খেলিনু খেলা, কহিব কেমনে?
বৈদেহীর সুকাহিনী শুনি লোকমুখে
শিবের মন্দিরে পশি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, ৭৫
পূজিতাম শিবধনুঃ! কহিতাম সাধে,—
'ঋষিবেশে স্বপ্ন আশু দেখাও জনকে
(জানি কামরূপ তুমি!) দিতে এ দাসীরে
সে পুরুষোত্তমে, যিনি দুই খণ্ড করি,
হে কোদণ্ড, ভাঙ্গিবেন তোমায় স্ববলে! ৮০
তা হলে পাইব নাথে, বলী-শ্রেষ্ঠ তিনি!'
শুনি বৈদর্ভীর কথা, ধরিতাম ফাঁদে

রাজহংসে ; দিয়া তারে আহার, পরায়ে
স্বর্ণ-ঘুংঘুর পায়ে, কহিতাম কানে,—
'যমুনার তীরে পুরী বিখ্যাত জগতে ৮৫
হস্তিনা ;—তথায় তুমি, রাজহংসপতি,
যাও শীঘ্র শূন্যপথে, হেরিবে সে পুরে
নরোত্তমে ; তাঁর পদে কহিও, দ্রৌপদী
তোমার বিরহে মরে দ্রুপদ-নগরে !'
এই কথা কয়ে তারে দিতাম ছাড়িয়া। ৯০
হেরিলে গগনে মেঘে, কহিতাম নমি ;—
'বাহন যাঁহার তুমি, মেঘ-কুল-পতি,
পুত্রবধূ তাঁর আমি, বহ তুলি মোরে,
বহ যথা বারি-ধারা, নাথের চরণে !
জল দানে চাতকীরে তোষ দাতা তুমি, ৯৫
তোমার বিরহে, হায়, তৃষাতুরা যথা
সে চাতকী, তৃষাতুরা আমি, ঘনমণি !
মোর সে বারিদ-পদে দেহ মোরে লয়ে !'
আর কি শুনিবে, নাথ ? উঠিল যৎকালে
জনরব—'জতুগৃহে যদি মাতৃ-সহ ১০০
ত্যজিলা অকালে দেহ পঞ্চ পাণ্ডুরথী'—
কত যে কাঁদিনু আমি, কব তা কাহারে ?
কাদিনু—বিধবা যেন হইনু যৌবনে !
প্রার্থিনু রতিরে পূজি,—'হর-কোপানলে,
হে সতি, পুড়িলা যবে প্রাণ-পতি তব, ১০৫
কত যে সহিলা দুঃখ, তাই স্মরি মনে,
বাঁচাও মদনে মোর,—এই ভিক্ষা মাগি !'
পরে স্বয়ম্বরোৎসব। আঁধার দেখিনু
চৌদিক, পশিনু যবে রাজসভা-মাঝে !
সাধিনু মাটিরে ফাটি হইতে দুখানি ! ১১০
দাঁড়াইয়া লক্ষ্য-তলে কহিনু, 'খসিয়া
পড় তুমি পোড়া শিরে বজ্রাগ্নি-সদৃশ,

হে লক্ষ্য! জ্বলিয়া আমি মরি তব তাপে,
প্রাণ-পতি জতুগৃহে জ্বলিলা যেমতি!
না চাহি বাঁচিতে আর! বাঁচিব কি সাধে? ১১৫
উঠিল সভায় রব,—'নারিলা ভেদিতে
এ অলক্ষ্য লক্ষ্যে আজি ক্ষত্ররথী যত।'—
জান তুমি, গুণমণি, কি ঘটিল পরে।
ভস্মরাশি মাঝে গুপ্ত বৈশ্বানর-রূপে
কি কাজ করিলা তুমি, কে না জানে ভবে, ১২০
রথীশ্বর? বজ্রনাদে ভেদিল আকাশে
মৎস্য-চক্ষুঃ তীক্ষ্ণ শর! সহসা ভাসিল
আনন্দ-সলিলে প্রাণ; শুনিনু সুবাণী
(স্বপ্নে যেন!) 'এই তোর পতি, লো পাঞ্চালি!
ফুল-মালা দিয়ে গলে, বর নরবরে!' ১২৫
চাহিনু বরিতে, নাথ, নিবারিলা তুমি
অভাগীর ভাগ্য-দোষে! তা হলে কি তবে
এ বিষম তাপে, হায়, মরিত এ দাসী?
কিন্তু বৃথা এ বিলাপ!—হুহুঙ্কারি রোষে,
লক্ষ রাজরথী যবে বেড়িল তোমারে; ১৩০
অম্বুরাশি-নাদ সম কম্বুরাশি যবে
নাদিল সে স্বয়ম্বরে;—কি কথা কহিয়া
সাহসিলা এ দাসীরে, পড়ে কি হে মনে?
যদি ভুলে থাক তুমি, ভুলিতে কি পারে
দ্রৌপদী? আসন্ন কালে সে সুকথাগুলি ১৩৫
জপিয়া মরিব, দেব, মহামন্ত্র-জ্ঞানে!
কহিলে সম্বোধি মোরে সুমধুর স্বরে;—
'আশারূপে মোর পাশে দাঁড়াও, রূপসি!
দ্বিগুণ বাড়িবে বল চন্দ্রমুখ হেরি,
চন্দ্রমুখি! যতক্ষণ ফণীন্দ্রের দেহে ১৪০
থাকে প্রাণ, কার সাধ্য হরে, শিরোমণি?
আমি পার্থ!'—ক্ষম, নাথ, লাগিল তিতিতে

অনর্গল অশ্রুজল এ লিপি! কেন না,—
হায় রে, কেন না আমি মরিনু চরণে
সে দিন! কি লিখি, হায়, না পাই দেখিতে! ১৪৫
আঁধা, বঁধু, অশ্রুনীরে এ তব কিঙ্করী!—* *
* * এত দূর লিখি কালি ফেলাইনু দূরে
লেখনী। আকুল প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া
স্মরি পূর্ব্ব-কথা যত। বসি তরু-মূলে,
হায় রে তিতিনু, নাথ, নয়ন-আসারে! ১৫০
কে মুছিল চক্ষু-জল? কে মুছিবে কহ?
কে আছে এ অভীভার এ ভব-মণ্ডলে?
ইচ্ছা করে ত্যজি প্রাণ ডুবি জলাশয়ে;
কিম্বা পান করি বিষ; কিন্তু ভাবি যবে,
প্রাণেশ, ত্যজিলে দেহ আর না পাইব ১৫৫
হেরিতে ও পদযুগ,—সান্ত্বনি পরাণে,
ভুলি অপমান, লজ্জা, চাহি বাঁচিবারে!
অগ্নিতাপে তপ্তা সোনা গলে হে সোহাগে,
পায় যদি সোহাগায়! কিন্তু কহ, রথি,
কবে ফিরি আসি দেখা দেবে এ কাননে? ১৬০
কহ ত্রিদিবের বার্ত্তা। কবীশ্বর তুমি,
গাঁথি মধুমাখা গাথা পাঠাও দাসীরে।
ইচ্ছা বড়, গুণমণি, পরিতে অলকে
পারিজাত; যদি তুমি আন সঙ্গে করি,
দ্বিগুণ আদরে ফুল পরিব কুন্তলে! ১৬৫
শুনেছি কামদা না কি দেবেন্দ্রের পুরী;—
এ দাসীর প্রতি যদি থাকে দয়া হৃদে,
ভুলিতে পার হে যদি সুর বালা-দলে,
এ কামনা কামধুকে কর দয়া করি,
পাও যেন অভাগীরে চরণ-কমলে ১৭০
ক্ষণ কাল! জুড়াইব নয়ন সুমতি
ও রূপ-মাধুরী হেরি,—ভুলি এ বিচ্ছেদে;

অপ্সরা-বল্লভ তুমি ; নর-নারী দাসী ;
তা বলে করো না ঘৃণা—এ মিনতি পদে!
স্বর্ণ-অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে, ১৭৫
কণ্ঠে, হস্তে ; পরে না কি রজত চরণে?
কি ভাবে কাটাই কাল এ বিকট বনে
আমরা, কহিব এবে, শুন, গুণনিধি।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-রত সদা ধর্ম্মরাজ-ঋষি ;
ধৌম্য পুরোহিত নিত্য তুষেন রাজনে ১৮০
শাস্ত্রালাপে! মৃগয়ায় রত ভ্রাতা তব
মধ্যম ; অনুজ-দ্বয়, মহা-ভক্তি ভাবে,
সেবেন অগ্রজ-দ্বয়ে ; যথাসাধ্য, দাসী
নির্ব্বাহে, হে মহাবাহু, গৃহ-কার্য্য যত।
কিন্তু ক্ষুণ্ণমনা সবে তোমার বিহনে! ১৮৫
স্মরি তোমা অশ্রুনীরে তিতেন নৃপতি,
আর তিন ভাই তব। স্মরিয়া তোমারে,
আকুল এ পোড়া প্রাণ, হায়, দিবা নিশি!
পাই যদি অবসর, কুটীর তেয়াগি
স্মৃতি-দূতী সহ, নাথ, ভ্রমি একাকিনী, ১৯০
পূর্ব্বের কাহিনী যত শুনি তাঁর মুখে!
পাণ্ডব-কুল-ভরসা, মহেম্বাস, তুমি!
বিমুখিবে তুমি, সখে, সম্মুখ সমরে
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শূরে ; নাশিবে কৌরবে!
বসাইবে রাজাসনে পাণ্ডু-কুল রাজে ; ১৯৫
এই গীত গায় আশা নিত্য এ আশ্রমে!
এ সঙ্গীত ধ্বনি, দেব, শুনি জাগরণে!
শুনি স্বপ্নে নিশাভাগে এ সঙ্গীত-ধ্বনি!
কে শিখায় অস্ত্র তোমা, কহ, সুরপুরে,
অস্ত্রী-কুল-গুরু-তুমি? এই সুর-দলে ২০০
প্রচণ্ড গাণ্ডীব তুমি টঙ্কারি হুঙ্কারে,
দমিলা খাণ্ডব রণে! জিনিলা একাকী

লক্ষরাজে, রথীরাজ, লক্ষ্য ভেদ কালে।
নিপাতিলা ভূমিতলে বলে ছদ্মবেশী
কিরাতেরে! এ ছলনা, কহ, কি কারণে? ২০৫
এস ফিরি, নবরত্ন! কে ফেরে বিদেশে
যুবতী পত্নীরে ঘরে রাখি একাকিনী?
কিন্তু যদি সুরনারী প্রেম-ফাঁদ পাতি
বেঁধে থাকে মনঃ, বঁধু, স্মর ভ্রাতৃ-ত্রয়ে—
তোমার বিরহ-দুঃখে দুঃখী অহরহ! ২১০

আর কি অধিক কব? যদি দয়া থাকে,
আসি দেখ কি দশায় তোমার বিরহে,
কি দশায়, প্রাণেশ্বর, নিবাসি এ দেশে।

পাইয়াছি দৈবে, দেব, এ বিজন বনে
ঋষিপত্নী, পুণ্যবতী; পূর্ব্বপুণ্য-বলে ২১৫
স্বেচ্ছাচর পুত্র তাঁর! তেজস্বী সুশিশু
দিবামুখে রবি যেন! বেদ-অধ্যয়নে
সদা রত! দয়া করি বহিবেন তিনি,
মাতৃ-অনুরোধে পত্র, দেবেন্দ্র সদনে।
যথাবিধি পূজা তাঁর করিও, সুমতি! ২২০
লিখিলে উত্তর তিনি আনিবেন হেথা।
কি কহিনু, নরোত্তম? কি কাজ উত্তরে?
পত্রবহ সহ ফিরি আইস এ বনে! ২২৩

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে দ্রৌপদী পত্রিকা নাম
ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ

দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী

[ভগদত্তপুত্রী ভানুমতী দেবী রাজা দুর্য্যোধনের পত্নী। কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন পাণ্ডবকুলের সহিত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যাত্রা করিলে অল্প দিনের মধ্যে রাজমহিষী ভানুমতী তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

অধীর সতত দাসী, যে অবধি তুমি
করি যাত্রা পশিয়াছ কুরুক্ষেত্র-রণে!
নাহি নিদ্রা; নাহি রুচি, হে নাথ, আহারে!
না পারি দেখিতে চখে খাদ্যদ্রব্য যত।
কভু যাই দেবালয়ে; কভু রাজোদ্যানে; ৫
কভু গৃহ-চূড়ে উঠি, দেখি নিরখিয়া
রণ-স্থল। রেণু-রাশি গগন আবরে
ঘন ঘনজালে যেন; জ্বলে শর-রাশি,
বিজলীর ঝলা সম ঝলসি নয়নে!
শুনি দূর সিংহনাদ, দূর শঙ্খ-ধ্বনি, ১০
কাঁপে হিয়া থরথরে! যাই পুনঃ ফিরি।
স্তম্ভের আড়ালে, দেব, দাঁড়ায়ে নীরবে,
শুনি সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের বারতা,
যথা বসি সভাতলে অন্ধ নরপতি!
কি যে শুনি, নাহি বুঝি—আমি পাগলিনী! ১৫
মনের জ্বালায় কভু জলাঞ্জলি দিয়া,
লজ্জায়, পড়িয়া কাঁদি শ্বাশুড়ীর-পদে,
নয়ন-আসারে ধৌত করি পা দুখানি!
নাহি সরে কথা মুখে, কাঁদি মাত্র খেদে!
নারি সান্ত্বনিতে মোরে, কাঁদেন মহিষী; ২০
কাঁদে কুরু-বধূ যত। কাঁদে উচ্চ-রবে,
মায়ের আঁচল ধরি কুরু-কুল-শিশু,
তিতি অশ্রুনীরে, হায়, না জানি কি হেতু!
দিবা নিশি এই দশা রাজ-অবরোধে।
কুক্ষণে মাতুল তব—ক্ষম দুঃখিনীরে! ২৫

কুক্ষণে মাতুল তব, ক্ষত্র-কুল-গ্লানি,
আইল হস্তিনাপুরে! কুক্ষণে শিখিলা
পাপ অক্ষবিদ্যা, নাথ, সে পাপীর কাছে!
এ বিপুল কুল, মরি মজালে দুর্ম্মতি,
কাল-কলিরূপে পশি এ বিপুল-কুলে! ৩০
ধর্ম্মশীল কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজ সম
কে আছে, কহ তা, শুনি? দেখ ভীমসেন,
ভীম পরাক্রমী শূর, দুর্ব্বার সমরে!
দেব নর-পূজ্য পার্থ—অব্যর্থ প্রহরী!
কত গুণে গুণী নাথ, নকুল সুমতি, ৩৫
সহ শিষ্ট সহদেব, জান না কি তুমি?
মেদিনী-সদনে রমা দ্রুপদ-নন্দিনী!
কার হেতু এ সবারে ত্যজিলা ভূপতি?
গঙ্গাজল পূর্ণ ঘটে, হায় ঠেলি ফেলি,
কেন অবগাহ দেহ কর্ম্মনাশা-জলে? ৪০
অবহেলি দ্বিজোত্তমে চণ্ডালে ভকতি?
অম্বু-বিম্ব, নীরবৃন্দ ফুলদূর্ব্বাদলে
নহে মুক্তাফল, দেব! কি আর কহিব?
কি ছলে ভুলিলা তুমি, কে কবে আমারে?
এখনও দেহ ক্ষমা, এ ভিক্ষা মাগি, ৪৫
ক্ষত্রমণি! ভাবি দেখ,—চিত্রসেন যবে,
কুরুবধূদলে বাঁধি তব সহ রথে,
চলিল গন্ধর্ব্বদেশে, কে রাখিল আসি
কুলমান প্রাণ তব, কুরুকুলমণি?
বিপদে হেরিলে অরি আনন্দ-সলিলে ৫০
ভাসে লোক; তুমি যার পরমারি, রাজা,
ভাসিল সে অশ্রুনীরে তোমার বিপদে!
হে কৌরবকুলনাথ তীক্ষ্ণ শরজালে
চাহ কি বধিতে প্রাণ তাহার সংগ্রামে,
প্রাণ, প্রাণাধিক মান রক্ষিল যে তব ৫৫

অসহায় যবে তুমি,—হায়, সিংহ-সম,
আনায়-মাঝারে বদ্ধ রিপুর কৌশলে ?
—হে দয়া কি হেতু, মাতঃ, এ পাপ সংসারে
মানব-হৃদয়ে তুমি কর গো বসতি !
কেন গর্ব্বী কর্ণে তুমি কর্ণদান কর, ৬০
রাজেন্দ্র ? দেবতাকুলে জিনিল যে রণে ;
তোমা সহ কুরুসৈন্যে দলিল একাকী
মৎস্যদেশে ; আঁটিবে কি রাধেয় তাহারে ?
হায়, বৃথা আশা, নাথ ! শৃগাল কি কভু
পারে বিমুখিতে, কহ, মৃগেন্দ্র সিংহেরে ? ৬৫
সূতপুত্র সখা তব ? কি লজ্জা, নৃমণি,
তুমি চন্দ্রবংশচূড়, ক্ষত্রবংশপতি ?
জানি আমি ভীমবাহু ভীষ্ম পিতামহ ;
দেব-নর-ত্রাস বীর্য্যে দ্রোণাচার্য্য গুরু।
স্নেহপ্রবাহিণী কিন্তু এ দোঁহার বহে ৭০
পাণ্ডবসাগরে, কান্ত কহিনু তোমারে !
যদিও না হয় তাহা, তবুও কেমনে,
হায় রে, প্রবোধি, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে ?
উত্তর-গোগৃহ-রণে জিনিল কিরীটী
একাকী এ বীরদ্বয়ে ! স্বজিলা কি, তুমি ৭৫
দাবাগ্নির রূপে, বিধি, জিষ্ণু ফাল্গুনিরে
এ দাসীর আশা-বন নাশিতে অকালে ?
শুন, নাথঃ নিদ্রা-আশে মুদি যদি কভু
এ পোড়া নয়ন দুটি ; দেখি মহাভয়ে
শ্বেত-অশ্ব কপিধ্বজ স্যন্দন সম্মুখে ! ৮০
রথমধ্যে কালরূপী পার্থ ! বাম করে
গাণ্ডীব,—কোদণ্ডোত্তম। ইরম্মদ-তেজা
মর্ম্মভেদী দেব-অস্ত্র শোভে হে দক্ষিণে !
কাঁপে হিয়া ভাবি শুনি দেবদত্ত-ধ্বনি !
গরজে বায়ুজ ধ্বজে কাল মেঘ যেন ! ৮৫

ঘর্ঘরে গম্ভীর রবে চক্র, উগরিয়া
কালাগ্নি। কি কব, দেব, কিরীটের আভা?
আহা, চন্দ্রকলা যেন চন্দ্রচূড় ভালে!
উজলিয়া দশ দিশ, কুরুসৈন্য-পানে
ধায় রথবর বেগে! পালায় চৌদিকে ৯০
কুরুসৈন্য,—তমঃ-পুঞ্জ রবির দর্শনে
যথা! কিম্বা বিহঙ্গম হেরিলে অদূরে
বজ্রনখ বাজে যথা পালায় কূজনি
ভীতচিত; মিলি আঁখি অমনি কাঁদিয়া!

কি কব ভীমের কথা? মদকল করী- ৯৫
সদৃশ উন্মদ দুষ্ট নিধন-সাধনে!
জবাযুগ সম আঁখি—রক্তবর্ণ সদা।
মার, মার শব্দ মুখে! ভীম গদা হাতে,
দণ্ডধর-হাতে, হায়, কালদণ্ড যথা!
শুনেছি লোকের মুখে, দেব সমাগমে ১০০
ধরিলা দুরন্তে গর্ভে কুন্তী ঠাকুরাণী।
কিন্তু যদি দেব পিতা, যমরাজ তবে—
সর্ব্ব অন্তকারী যিনি! ব্যাঘ্রী বুঝি দিল
দুগ্ধ দুষ্টে! নর-নারী স্তন-দুগ্ধ কভু
পালে কি, কহ, হে নাথ, হেন নর-যমে? ১০৫

বাড়িতে লাগিল লিপি; তবুও কহিব
কি কুস্বপ্ন, প্রাণনাথ, গত নিশাকালে
দেখিনু;—বুঝিয়া দেখ, বিজ্ঞতম তুমি;
আকুল সতত প্রাণ, না পারি বুঝিতে
এ কুহক! গত রাত্রে বসি একাকিনী ১১০
শয়নমন্দিরে তব—নিরানন্দ এবে—
কাঁদিনু! সহসা, নাথ, পূরিল সৌরভে
দশ দিশ; পূর্ণচন্দ্র আভা জিনি আভা
উজ্জ্বলিল চারি দিক্; দাসীর সম্মুখে
দাঁড়াইলা দেববালা—অতুলা জগতে ১১৫

চমকি চরণযুগে নমিনু সভয়ে।
মুছিয়া নয়নজল, কহিলা কাতরে
বিধুমুখী,—বৃথা খেদ, কুরুকুলবধূ,
কেন তুমি কর আর? কে পারে খণ্ডাতে
বিধির বাঁধন, হায়, এ ভবমণ্ডলে? 	১২০
ওই দেখ যুদ্ধক্ষেত্র!'—দেখিনু তরাসে,
যত দূর চলে দৃষ্টি, ভীম রণভূমি!
বহিছে শোণিত-স্রোত প্রবাহিণীরূপে;
পড়িয়াছে গজরাজি, শৈলশৃঙ্গ যেন
চূর্ণ বজ্রে; হতগতি অশ্ব; রথাবলী 	১২৫
ভগ্ন; শত শত শব! কেমনে বর্ণিব
কত যে দেখিনু, নাথ, সে কাল মশানে!
দেখিনু রথীন্দ্র এক শরশয্যোপরি!
আর এক মহারথী পতিত ভূতলে,
কণ্ঠে শূন্যগুণ ধনু;—দাঁড়ায়ে নিকটে, 	১৩০
আস্ফালিছে অসি অরি-মস্তক চ্ছেদিতে!
আর এক বীরবরে দেখিনু শয়নে
ভূশয্যায়! রোষে মহী গ্রাসিয়াছে ধরি
থরচক্র; নাহি বক্ষে কবচ; আকাশে
আভাহীন ভানুদেব,—মহশোকে যেন! 	১৩৫
অদূরে দেখিনু হ্রদ; সে হ্রদের তীরে
রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি
ভগ্ন ঊরু! কাঁদি উচ্চে, উঠিনু জাগিয়া!
কেন এ কুস্বপ্ন, দেব, দেখাইলা মোরে?
এস তুমি, প্রাণনাথ, রণ পরিহরি! 	১৪০
পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরথী!
কি অভাব তব, কহ? তোষ পঞ্চ জনে;
তোষ অন্ধ বাপ মায়ে; তোষ অভাগীরে;—
রক্ষ কুরুকুল, ওহে কুরুকুলমণি! 	১৪৪

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে ভানুমতী-পত্রিকা নাম
সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ

জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা

[অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলা দেবী সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের মহিষী। অভিমন্যুর নিধনান্তর পার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে দুঃশলা দেবী নিতান্ত ভীতা হইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি জয়দ্রথের নিকট প্রেরণ করেন।]

কি যে লিখিয়াছে বিধি এ পোড়া কপালে,
হায়, কে কহিবে মোরে,—জ্ঞানশূন্য আমি!
শুন, নাথ, মনঃ দিয়া;—মধ্যাহ্নে বসিনু
অন্ধ পিতৃপদতলে, সঞ্জয়ের মুখে
শুনিতে রণের বার্ত্তা। কহিলা সুমতি— ৫
(না জানি পূর্ব্বের কথা; ছিনু অবরোধে
প্রবোধিতে জননীরে); কহিলা সুমতি
সঞ্জয়,—'বেড়িল পুনঃ সপ্ত মহারথী
সুভদ্রানন্দনে, দেব! কি আশ্চর্য্য, দেখ—
অগ্নিময় দশ দিশ পুনঃ শরানলে ১০
প্রাণপণে যোঝে যোধ; হেলায় নিবারে
অস্ত্রজালে শূরসিংহ! ধন্য শূরকুলে
অভিমন্যু!' নীরবিলা এতেক কহিয়া
সঞ্জয়। নীরবে সবে রাজসভাতলে
সঞ্জয়ের মুখ পানে রহিলা চাহিয়া। ১৫
'দেখ, কুরুকুলনাথ'—পুনঃ আরম্ভিলা
দূরদর্শী,—'ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পুনঃ
পালাইছে সপ্ত রথী! নাদিছে ভৈরবে
আর্জ্জুনি, পাবক যেন গহন বিপিনে!
পড়িছে অগণ্য রথী, পদাতিক ব্রজ; ২০
গরজি মরিছে গজ বিষম পীড়নে;
সভয়ে হ্রেষিছে অশ্ব! হায় দেখ চেয়ে,

কাঁদিছেন পুত্র তব দ্রোণগুরুপদে!—
মজিল কৌরব আজি আর্জ্জুনির রণে!'
কাঁদিলা আক্ষেপে পিতা; কাঁদিয়া মুছিনু ২৫
অশ্রুধারা। দূরদর্শী আবার কহিলা;—
'ধাইছে সমরে পুনঃ সপ্ত মহারথী,
কুরুরাজ! লাগে তালি কর্ণমূলে শুনি
কোদণ্ড-টঙ্কার, প্রভু! বাজিল নির্ঘোষে
ঘোর রণ! কোন রথী গুণ সহ কাটে ৩০
ধনু; কেহ রথচূড়, রথচক্র কেহ।
কাটিয়া পাড়িলা দ্রোণ ভীম-অস্ত্রাঘাতে
কবচ; মরিল অশ্ব; মরিল সারথি!
রিক্তহস্ত এবে বীর, তবুও যুঝিছে
মদকল হস্তী যেন মত্ত রণমদে!'— ৩৫
নীরবিয়া ক্ষণকাল, কহিলা কাতরে
পুনঃ দূরদর্শী;—'আহা! চিররাহু-গ্রাসে
এ পৌরব-কুল-ইন্দু পড়িলা অকালে!
অন্যায় সমরে, নাথ, গতজীব, দেখ,
আর্জ্জুনি! হুঙ্কারে, শুন, সপ্ত জয়ী রথী, ৪০
নাদিছে কৌরবকুল জয় জয় রবে!
নিরানন্দে ধর্ম্মরাজ চলিলা শিবিরে।'
হরষে বিষাদে পিতা, শুনি এ বারতা,
কাঁদিলা; কাঁদিনু আমি। সহসা ত্যজিয়া
আসন সঞ্জয় বুধ, কৃতাঞ্জলি পুটে, ৪৫
কহিলা সভয়ে,—'উঠ, কুরুকুলপতি!
পূজ কুলদেবে শীঘ্র জামাতার হেতু!
ওই দেখ কপিধ্বজে ধাইছে ফাল্গুনি
অধীর বিষম শোকে! গরজে গম্ভীরে
হনূ স্বর্ণরথচূড়ে। পড়িছে ভূতলে ৫০
খেচর; ভূচরকুল পালাইছে দূরে!
ঝকঝকে দিব্য বর্ম্ম; খেলিছে কিরীটে

চপলা ; কাঁপিছে ধরা থর থর থরে !
পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে কুরু ; পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে
আপনি পাণ্ডব, নাথ, গাণ্ডীবীর কোপে ! ৫৫
মুহুর্মুহুঃ, ভীমবাহু টঙ্কারিছে বামে
কোদণ্ড—ব্রহ্মাণ্ডত্রাস ! শুন কর্ণ দিয়া,
কহিছে বীরেশ রোষে ভৈরব নিনাদে ;—
'কোথা জয়দ্রথ এবে,—রোধিল যে বলে
ব্যূহমুখ ? শুন, কহি, ক্ষত্ররথী যত, ৬০
তুমি, হে বসুধা, শুন ; তুমি জলনিধি ;
তুমি, স্বর্গ, শুন ; তুমি পাতাল পাতালে ;
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা জীব এ জগতে
আছ যত, শুন সবে ! না বিনাশি যদি
কালি জয়দ্রথে রণে, মরিব আপনি ! ৬৫
অগ্নিকুণ্ডে পশি তবে যাব ভূতদেশে,
না ধরিব অস্ত্র আর এ ভব সংসারে !'—
অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদতলে
পড়িনু ! যতনে মোরে আনিয়াছে হেথা—
এই অন্তঃপুরে—চেড়ী পিতার আদেশে। ৭০
কহ এ দাসীরে, নাথ ; কহ সত্য করি ;
কি দোষে আবার দোষী জিষ্ণুর সকাশে
তুমি ? পূর্ব্বকথা স্মরি চাহে কি দণ্ডিতে
তোমায় গাণ্ডীবী পুনঃ ? কোথায় রোধিলে
কোন্ ব্যূহমুখ তুমি কহ তা আমারে ? ৭৫
কহ শীঘ্র, নহে, দেব, মরিব তরাসে !
কাঁপিছে এ পোড়া হিয়া থরথর করি !
আঁধার নয়ন, হায়, নয়নের জলে !
নাহি সরে কথা, নাথ, রসশূন্য মুখে !
কাল অজাগর-গ্রাসে পড়িলে কি বাঁচে ৮০
প্রাণী ? ক্ষুধাতুর সিংহ ঘোর সিংহনাদে
ধরে যবে বনচরে, কে তারে তাহারে ?

কে কহ, রক্ষিবে তোমা, ফাল্গুনি রুষিলে ?
　　হে বিধাতঃ, কি কুক্ষণে, কোন্ পাপদোষে
আনিলে নাথেরে হেথা, এ কাল সমরে ৮৫
তুমি ? শুনিয়াছি আমি, যে দিন জন্মিলা
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অমঙ্গল ঘটিল সে দিনে !
নাদিল কাতরে শিবা ; কুকুর কাঁদিল
কোলাহলে ; শূন্যমার্গে গর্জ্জিল ভীষণে
শকুনি গৃধিনীপাল ! কহিলা জনকে ৯০
বিদুর,—সুমতি তাত ! 'ত্যজ এ নন্দনে,
কুরুরাজ ! কুরুবংশ-ধ্বংসরূপে আজি
অবতীর্ণ তব গৃহে !' না শুনিলা পিতা
সে কথা ! ভুলিলা, হায়, মোহের ছলনে !
ফলিল সে ফল এবে নিশ্চয় ফলিল ! ৯৫
শরশয্যাগত ভীষ্ম, বৃদ্ধ পিতামহ—
পৌরব-পঙ্কজ-রবি চির রাহুগ্রাসে !
বীর্য্যাঙ্কুর অভিমন্যু হতজীব রণে !
কে ফিরে আসিবে বাঁচি এ কাল সমরে ?
　　এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি ! ১০০
ফেলি দূরে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, তূণ, ধনু,
ত্যজি রথ, পদব্রজে এস মোর পাশে।
এস, নিশাযোগে দোঁহে যাইব গোপনে
যথায় সুন্দরী পুরী সিন্ধুনদতীরে
হেরে নিজ প্রতিমূর্ত্তি বিমল সলিলে ১০৫
হেরে হাসি সুবদনা সুবদন যথা
দর্পণে ! কি কাজ রণে তোমায় ? কি দোষে
দোষী তব কাছে, কহ, পঞ্চপাণ্ডু রথী
চাহে কি হে অংশ তারা তব রাজ্য ধনে ?
তবে যদি কুরুরাজে ভাল বাস তুমি, ১১০
মম হেতু, প্রাণনাথ ; দেখ ভাবি মনে,
সমপ্রেমপাত্র তব কুন্তীপুত্র বলী।

ভ্রাতা মোর কুরুরাজ ; ভ্রাতা পাণ্ডুপতি !
এক জন জন্যে কেন ত্যজ অন্য জনে,
কুটুম্ব উভয় তব ?—আর কি কহিব ? ১১৫
কি ভেদ হে নদদ্বয়ে জন্ম হিমাদ্রিতে ?
তবে যদি গুণ দোষ ধর, নরমণি ;—
পাপ অক্ষক্রীড়া-ফাঁদ কে পাতিল, কহ ?
কে আনিল সভাতলে (কি লজ্জা !) ধরিয়া
রজস্বলা ভ্রাতৃবধূ ? দেখাইল তাঁরে ১২০
উরু ? কাড়ি নিতে তাঁর বসন চাহিল—
উলঙ্গিতে অঙ্গ, মরি, কুলাঙ্গনা তিনি ?
ভ্রাতার সুকীর্ত্তি যত, জান না কি তুমি ?
লিখিতে শরমে, নাথ, না সরে লেখনী !
এস শীঘ্র, প্রাণসখে, রণভূমি ত্যজি ১২৫
নিন্দে যদি বীরবৃন্দ তোমায়, হাসিও
স্বমন্দিরে বসি তুমি ! কে না জানে, কহ,
মহারথী রথীকুলে সিন্ধু-অধিপতি ?
যুঝেছ অনেক যুদ্ধে ; অনেক বধেছ
রিপু ; কিন্তু এ কৌন্তেয়, হায়, ভবধামে ১৩০
কে আছে প্রহরী, কহ, ইহার সদৃশ ?
ক্ষত্রকুল-রথী তুমি, তবু নরযোনি ;
কি লাজ তোমার, নাথ, ভঙ্গ যদি দেহ
রণে তুমি হেরি পার্থে, দেবযোনি-জয়ী ?
কি করিলা আখণ্ডল খাণ্ডব দাহনে ? ১৩৫
কি করিলা চিত্রসেন গন্ধর্ব্বাধিপতি ?
কি করিলা লক্ষ রাজা স্বয়ম্বর কালে ?
স্মর, প্রভু ! কি করিলা উত্তর গোগৃহে
কুরুসৈন্য নেতা যত পার্থের প্রতাপে ?
এ কালাগ্নি কুণ্ডে, কহ, কি সাধে পশিবে ? ১৪০
কি সাধে ডুবিবে, হায়, এ অতল জলে ?
ভুলে যদি থাক মোরে, ভুলনা নন্দনে,

সিন্ধুপতি ; মণিভদ্রে ভুল না, নৃমণি !
নিশার শিশির যথা পালয়ে মুকুলে
রসদানে ; পিতৃস্নেহ, হায় রে, শৈশবে ১৪৫
শিশুর জীবন, নাথ, কহিনু তোমারে !

জানি আমি কহিতেছে আশা তব কানে—
মায়াবিনী !—'দ্রোণ গুরু সেনাপতি এবে ;
দেখ কর্ণ ধনুর্দ্ধরে ; অশ্বথামা শূরে ;
কৃপাচার্য্যে ; দুর্য্যোধনে—ভীম গদাপানি ! ১৫০
কাহারে ডরাও তুমি, সিন্ধুদেশপতি ?
কে সে পার্থ ? কি সামর্থ্য তাহার নাশিতে
তোমায় ?'—শুন না, নাথ, ও মোহিণী বাণী !
হায়, মরীচিকা আশা ভব-মরুভূমে !
মুদি আঁখি ভাব,—দাসী পড়ি পদতলে ; ১৫৫
পদতলে মণিভদ্র কাঁদিছে নীরবে !

ছদ্মবেশে রাজদ্বারে থাকিব দাঁড়ায়ে
নিশীথে ; থাকিবে সঙ্গে নিপুণিকা সখী,
লয়ে কোলে মণিভদ্রে। এসো ছদ্মবেশে,
না কয়ে কাহারে কিছু ! অবিলম্বে যাব ১৬০
এ পাপ নগর ত্যজি সিন্ধুরাজালয়ে !
কপোতমিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে !
ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে কুরু পাণ্ডু কুলে ! ১৬৩

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে দুঃশলা-পত্রিকা নাম
অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ

শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী

[জাহ্নবী দেবীর বিরহে রাজা শান্তনু একান্ত কাতর হইয়া রাজ্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বহু দিবস গঙ্গাতীরে উদাসীনভাবে কালাতিপাত করেন। অষ্টম বসু অবতার দেবব্রত (যিনি মহাভারতীয় ইতিবৃত্তে ভীষ্ম পিতামহ নামে প্রথিত) বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জাহ্নবী দেবী নিম্নলিখিত পত্রিকাখানির সহিত পুত্রবরকে রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

বৃথা তুমি, নরপতি, ভ্রম মম তীরে,—
বৃথা অশ্রুজল তব, অনর্গল বহি,
মম জলদল সহ মিশে দিবানিশি!
ভুল ভূতপূর্ব্ব কথা ভুলে লোক যথা
স্বপ্ন—নিদ্রা-অবসানে! এ চিরবিচ্ছেদে ৫
এই হে ঔষধ মাত্র, কহিনু তোমারে!
হর-শির-নিবাসিনী হরপ্রিয়া আমি
জাহ্নবী। তবে যে কেন নরনারীরূপে
কাটাইনু এত কাল তোমার আলয়ে,
কহি, শুন। ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সরোষে ১০
ভূতলে জন্মিতে শাপ দিলা বসুদলে
যে দিন, পড়িল তারা কাঁদি মোর পদে,
করিয়া মিনতি স্তুতি নিষ্কৃতির আশে।
দিনু বর—'মানবিনী ভাবে ভবতলে
ধরিব এ গর্ভে আমি তোমা সবাকারে।' ১৫
বরিনু তোমারে সাধে, নরবর তুমি,
কৌরব! ঔরসে তব ধরিনু উদরে
অষ্ট শিশু,—অষ্ট বসু তারা, নরমণি!
ফুটিল এক মৃণালে অষ্ট সরোরুহ!
কত যে পুণ্য হে তব, দেখ ভাবি মনে! ২০
সপ্ত জন ত্যজি দেহ গেছে স্বর্গধামে।

অষ্টম নন্দনে আজি পাঠাই নিকটে ;
দেবনররূপী রত্নে গ্রহ যত্নে তুমি,
রাজন্! জাহ্নবীপুত্র দেবব্রত বলী
উজ্জ্বলিবে বংশ তব, চন্দ্রবংশপতি ;— ২৫
শোভিবে ভারত-ভালে শিরোমণিরূপে,
যথা আদিপিতা তব চন্দ্রচূড়-চূড়ে !
পালিয়াছি পুত্রবরে আদরে নৃমণি,
তব হেতু। নিরখিয়া চন্দ্রমুখ, ভুল
এ বিচ্ছেদ-দুঃখ তুমি ! অখিল জগতে, ৩০
নাহি হেন গুণী আর, কহিনু তোমারে !
মহাচল-কুল-পতি হিমাচল যথা ;
নদপতি সিন্ধুনদ ; বন-কুলপতি
খাণ্ডব ; রথীন্দ্রপতি দেবব্রত রথী—
বশিষ্ঠের শিষ্যশ্রেষ্ঠ ! আর কব কত ? ৩৫
আপনি বাগ্‌দেবী, দেব, রসনা-আসনে
আসীনা ; হৃদয়ে দয়া, কমলে কমলা ;
যমসম বল ভুজে ! গহন বিপিনে
যথা সর্ব্বভুক্ বহ্নি, দুর্ব্বার সমরে !
তব পুণ্যবৃক্ষ ফল এই, নরপতি ! ৪০
স্নেহের সরসে পদ্ম ! আশার আকাশে
পূর্ণশশী ! যত দিন ছিনু তব গৃহে,
পাইনু পরম প্রীতি ! কৃতজ্ঞতাপাশে
বেঁধেছ আমারে তুমি ; অভিজ্ঞানরূপে
দিতেছি এ রত্ন আমি, গ্রহ, শান্তমতি। ৪৫
পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।
অসীম মহিমা তব ; কুল মান ধনে
নরকুলেশ্বর তুমি এ বিশ্বমণ্ডলে।
তরুণ যৌবন তব ;—যাও ফিরি দেশে ;—
কাতরা বিরহে তব হস্তিনা নগরী ! ৫০
যাও ফিরি, নরবর, আন গৃহে বরি

বরাঙ্গী রাজেন্দ্রবালে ; কর রাজ্য সুখে !
পাল প্রজা ; দম রিপু ; দণ্ড পাপাচারে—
এই হে সুরাজনীতি ;—বাড়াও সতত
সতের আদর সাধি সৎক্রিয়া যতনে ৫৫
বরিও এ পুত্রবরে যুবরাজ-পদে
কালে। মহাযশা পুত্র হবে তব সম,
যশস্বি ; প্রদীপ যথা জলে সমতেজে
সে প্রদীপ সহ যার তেজে সে তেজস্বী !
কি কাজ অধিক কয়ে ? পূর্ব্বকথা ভুলি, ৬০
করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ,
প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা ! শৈলেন্দ্রনন্দিনী
রুদ্রেন্দ্রগৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে !
যত দিন ভবধামে রহে এ প্রবাহ,
ঘোষিবে তোমার যশ, গুণ, ভবধামে ! ৬৫
কহিবে ভারতজন,—ধন্য ক্ষত্রকুলে
শান্তনু, তনয় যার দেবব্রত রথী !
লয়ে সঙ্গে পুত্রধনে যাও রঙ্গে চলি
হস্তিনায়, হস্তিগতি। অন্তরীক্ষে থাকি
তব পুরে, তব সুখে হইব হে সুখী, ৭০
তনয়ের বিধুমুখ হেরি দিবানিশি ! ৭১

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে জাহ্নবী-পত্রিকা নাম
নবম সর্গ

দশম সর্গ

পুরুরবার প্রতি উর্ব্বশী

[চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুরবা কোন সময়ে কেশী নামক দৈত্যের হস্ত হইতে উর্ব্বশীকে উদ্ধার করেন। উর্ব্বশী রাজার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গ কবি কালিদাসকৃত বিক্রমোর্ব্বশী নামক ত্রোটক পাঠ করিলে, ইহার সবিশেষ বৃতান্ত জানিতে পারিবেন।]

স্বর্গচ্যুত আজি, রাজা, তব হেতু আমি!—
গত রাত্রে অভিনিনু দেব-নাট্যশালে
লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাম নাটক; বারুণী
সাজিল মেনকা; আমি অম্ভোজা ইন্দিরা।
কহিলা বারুণী,—'দেখ নিরখি চৌদিকে, ৫
বিধুমুখি! দেবদল এই সভাতলে;
বসিয়া কেশব ওই! কহ মোরে, শুনি,
কার প্রতি ধায় মনঃ?'—গুরুশিক্ষা ভুলি,
আপন মনের কথা দিয়া উত্তরিনু—
'রাজা পুরুরবা প্রতি!'—হাসিলা কৌতুকে ১০
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ, আর দেব যত।
চারিদিকে হাস্যধ্বান উঠিল সভাতে!
সরোষে ভরতঋষি শাপ দিলা মোরে!
শুন, নরকুলনাথ! কহিনু যে কথা ১৫
মুক্তকণ্ঠে কালি আমি দেবসভাতলে,
কহিব সে কথা আজি—কি কাজ শরমে?
কহিব সে কথা আজি তব পদযুগে!
যথা বহে প্রবাহিনী বেগে সিন্ধুনীরে,
অবিরাম; যথা চাহে রবিচ্ছবি পানে
স্থির আঁখি সূর্য্যমুখী; ও চরণে রত ২০
এ মনঃ! উর্ব্বশী, প্রভু, দাসী হে তোমারি!
ঘৃণা যদি কর, দেব, কহ শীঘ্র, শুনি।

অমরা অপ্সরা আমি, নারিব ত্যজিতে
কলেবর ; ঘোর বনে পশি আরম্ভিব
তপঃ তপস্বিনীবেশে, দিয়া জলাঞ্জলি ২৫
সংসারের সুখে, শূর ! যদি কৃপা কর,
তাও কহ ; যাব উড়ি ও পদ আশ্রয়ে,
পিঞ্জর ভাঙিলে উড়ে বিহঙ্গিনী যথা
নিকুঞ্জে ! কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে ?

শুভক্ষণে কেশী, নাথ, হরিল আমারে ৩০
হেমকূটে ! এখনও বসিয়া বিরলে
ভাবি সে সকল কথা ! ছিনু পড়ি রথে,
হায় রে, কুরঙ্গী যথা ক্ষত অস্ত্রাঘাতে ?
সহসা কাঁপিল গিরি ! শুনিনু চমকি
রথচক্রধ্বনি দূরে শতস্রোতঃ সমঃ। ৩৫
শুনিনু গম্ভীর নাদ—'অরে রে দুর্ম্মতি,
মুহূর্ত্তে পাঠাব তোরে শমনভবনে,—
প্রতিনাদরূপে কেশী নাদিল ভৈরবে !
হারাইনু জ্ঞান আমি সে ভীষণ স্বনে !

পাইনু চেতন যবে, দেখিনু সম্মুখে ৪০
চিত্রলেখা সখী সহ ও রূপমাধুরী—
দেবী মানবীর বাঞ্ছা ! উজ্জ্বল দেখিনু,
দ্বিগুণ, হে গুণমণি, তব সমাগমে
হেমকূট হৈমকান্তি—রবিকরে যেন !

রহিনু মুদিয়া আঁখি শরমে, নৃমণি ; ৪৫
কিন্তু এ মনের আঁখি মীলিল হরষে,
দিনান্তে কমলাকান্তে হেরিলে যেমতি
কমল ! ভাসিল হিয়া আনন্দ-সলিলে !

চিত্রলেখা পানে তুমি কহিলা চাহিয়া,—
'যথা নিশা, হে রূপসি, শশীর মিলনে ৫০
তমোহীনা ; রাত্রিকালে অগ্নিশিখা যথা
ছিন্নধূমপুঞ্জ-কায়া ; দেখ নিরখিয়া,

এ বরাঙ্গ বররুচি রচ্যমান এবে
মোহান্তে! ভাঙিলে পাড়, মলিনসলিলা
হয়ে ক্ষণ, এইরূপে বহেন জাহ্নবী ৫৫
আবার প্রসাদে, শুভে!'—আর যা কহিলে,
এখনো পড়িলে মনে বাখানি, নৃমণি,
রসিকতা! নরকুল ধন্য তব গুণে!
এ পোড়া হৃদয় কম্পে কম্পবান দেখি,
মন্দারের দাম বক্ষে, মধুচ্ছন্দে তুমি ৬০
পড়িলা যে শ্লোক, কবি পড়ে কি হে মনে?
ম্রিয়মাণ জন যথা শুনে ভক্তিভাবে
জীবনদায়ক মন্ত্র, শুনিল উর্ব্বশী,
হে সুধাংশু-বংশ-চূর, তোমার সে গাথা!
সুরবালা-মনঃ তুমি ভুলালে সহজে, ৬৫
নররাজ! কেনই বা না ভুলাবে, কহ?—
সুরপুর-চির, চির অরি অধীর বিক্রমে
তোমার, বিক্রমাদিত্য! বিধাতার বরে,
বজ্রীর অধিক বীর্য্য তব রণস্থলে!
মলিন মনোজ লাজে ও সৌন্দর্য্য হেরি! ৭০
তব রূপগুণে তবে কেন না মজিবে
সুরবালা? শুন, রাজা! তব রাজবনে
স্বয়ম্বরবধূ-লতা বরে সাধে যথা
রসালে, রসালে বরে তেমতি নন্দনে!
স্বয়ম্বরবধূ-লতা! রূপগুণাধীনা ৭৫
নারীকুল, নরশ্রেষ্ঠ, কি ভবে কি দিবে—
বিধির বিধান এই, কহিনু তোমারে!

কঠোর তপস্যা নর করি যদি লভে
স্বর্গভোগ; সর্ব্ব অগ্রে বাঞ্ছে সে ভুঞ্জিতে
যে স্থির-যৌবন-সুধা—অর্পিব তা পদে! ৮০
বিকাইব কায়মনঃ উভয়, নৃমণি,
আসি তুমি কেন দোঁহে প্রেমের বাজারে!

উর্ব্বীধামে উর্ব্বশীরে দেহ স্থান এবে,
উর্ব্বীশ! রাজস্ব দাসী দিবে রাজপদে
প্রজাভাবে নিত্য যত্নে। কি আর লিখিব? ৮৫
বিষের ঔষধ বিষ,—শুনি লোকমুখে
মরিতেছিনু, নৃমণি, জ্বলি কামবিষে,
তেঁই শাপবিষ বুঝি দিয়াছেন ঋষি,
কৃপা করি! বিজ্ঞ তুমি, দেখ হে ভাবিয়া!
দেহ আজ্ঞা, নরেশ্বর, সুরপুর ছাড়ি ৯০
পড়ি ও রাজীব-পদে, পড়ে বারিধারা
যথা ছাড়ি মেঘাশ্রয়, সাগর-আশ্রয়ে—
নীলাম্বুরাশির সহ মিশিতে আমোদে!
লিখিনু এ লিপি বসি মন্দাকিনী-তীরে
নন্দনে! ভূমিষ্ঠভাবে পূজিয়াছি, প্রভু, ৯৫
কল্পতরুবরে, কয়ে মনের বাসনা।
সুপ্রফুল্ল ফুল দেব পড়িয়াছে শিরে!
বীচিরবে হরপ্রিয়া শ্রবণ-কুহরে
আমার কহেন—'তুই হবি ফলবতী!
এ সাহসে, মহেষ্বাস, পাঠাই সকাশে, ১০০
পত্রিকা বাহিকা সখী চারু-চিত্রলেখা।
থাকিব নিরখি পথ, স্থির-আঁখি হয়ে
উত্তরার্থে, পৃথ্বীনাথ!—নিবেদনমিতি! ১০৩
ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা কাব্যে উর্ব্বশী-পত্রিকা নাম
দশম সর্গ।

একাদশ সর্গ

নীলধ্বজের প্রতি জনা

[মাহেশ্বরী পুরীর যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধ-যজ্ঞাশ্ব ধরিলে,—পার্থ তাহাকে রণে নিহত করেন। রাজা নীলধ্বজ রায় পার্থের সহিত বিপদপরাঙ্মুখ হইয়া সন্ধি করাতে, রাজ্ঞী জনা পুত্রশোকে একান্ত কাতরা হইয়া এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করেন। পাঠকবর্গ মহাভারতীয় অশ্বমেধপর্ব্ব পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।]

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি ;
হ্রেষে অশ্ব ; গর্জ্জে গজ ; উড়িছে আকাশে
রাজকেতু ; মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য ;—কিন্তু কোন্ হেতু ?
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে— ৫
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে ?
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
মহাবাহু—যাও বেগে গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি নিনাদে ! ১০
টুট কিরীটীর গর্ব্ব আজি রণস্থলে !
খণ্ডমুণ্ড তার আন শূল-দণ্ড-শিরে !
অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে ;
নাশ, মহেষ্বাস, তারে ! ভুলিব এ জ্বালা,
এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে ! ১৫
জন্মে মৃত্যু ;—বিধাতার এ বিধি জগতে।
ক্ষত্রকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি,
সম্মুখসমরে পড়ি, গেছে স্বর্গধামে,—
কি কাজ বিলাপে, প্রভু ? পাল, মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম্ম, ক্ষত্রকর্ম্ম সাধ ভুজবলে ২০

হায়, পাগলিনী জনা! তব সভামাঝে
নাচিছে নর্ত্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি! তব সিংহাসনে
বসিছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে!
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে।— ২৫

কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায়, কব কারে?
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী?
যে দারুণ বিধি, রাজা আঁধারিলা আজি
রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি ৩০
জ্ঞান তব? তা না হলে, কহ মোরে, কেন
এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
অতিথি? কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এই কি, নৃমণি? ৩৫
কোথা ধনু, কোথা তূণ, কোথা চর্ম্ম, অসি?
না ভেদি রিপুর বক্ষ তীক্ষ্ণতম শরে
রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি
কর্ণ তার সভাতলে? কি কহিবে, কহ,
যবে দেশ-দেশান্তরে জনরব লবে ৪০
এ কাহিনী,—কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত?

নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিনু, পূজিছ
পার্থে রাজা, ভক্তিভাবে; এ কি ভ্রান্তি তব?
হায়, ভোজবালা কুন্তী—কে না জানে তারে,
স্বৈরিণী? তনয় তার জারজ অর্জ্জুনে ৪৫
(কি লজ্জা,) কি গুণে তুমি পূজ, রাজরথি
নরনারায়ণ-জ্ঞানে? রে দারুণ বিধি
এ কি লীলাখেলা তোর, বুঝিব কেমনে?
একমাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে
অকালে?—আছিল মান,—তাও কি নাশিলি? ৫০

নরনারায়ণ পার্থ? কুলটা যে নারী—
বেশ্যা—গর্ভে তার কি হে জনমিলা আসি
হৃষীকেশ? কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ বেদে লেখে—
কি পুরাণে—এ কাহিনী? দ্বৈপায়ন ঋষি
পাণ্ডব-কীর্ত্তন গান গায়েন সতত। ৫৫
সত্যবতীসুত ব্যাস বিখ্যাত জগতে!
ধীবরী জননী, পিতা ব্রাহ্মণ! করিলা
কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধূদ্বয়ে
ধর্ম্মমতি! কি দেখিয়া, বুঝাও দাসীরে,
গ্রাহ্য কর তাঁর কথা, কুলাচার্য্য তিনি ৬০
কু-কুলের? তবে যদি অবতীর্ণ ভবে
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া
ইন্দিরা? দ্রৌপদী বুঝি? আঃ মরি, কি সতী!
শাশুড়ীর যোগ্য বধূ! পৌরব-সরসে
নলিনী! অলির সখী, রবির অধীনী, ৬৫
সমীরণ-প্রিয়া! ধিক্! হাসি আসে মুখে,
(হেন দুঃখে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা!
লোক-মাতা রমা কি হে এ ভ্রষ্টা রমণী?
  জানি আমি কহে লোক রথীকুল-পতি
পার্থ। মিথ্যা কথা, নাথ! বিবেচনা কর, ৭০
সূক্ষ্ম বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে।—
ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল দুর্ম্মতি
স্বয়ম্বরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন্ ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে? রাজদলে তেঁই সে জিতিল! ৭৫
দহিল খাণ্ডব দুষ্ট কৃষ্ণের সহায়ে।
শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র রণে
পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে
সংহারিল মহাপাপী! দ্রোণাচার্য্য গুরু,— ৮০
কি কুছলে নরাধম বধিল তাঁহারে,

দেখ স্মরি ? বসুন্ধরা গ্রাসিলা সরোষে
রথচক্র যবে, হায় ; যবে ব্রহ্মশাপে
বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাযশাঃ,
নাশিল বর্ব্বর তাঁরে। কহ মোরে, শুনি,
মহারথী-প্রথা কি হে এই, মহারথি ? ৮৫
আনায়-মাঝারে আনি মৃগেন্দ্র কৌশলে
বধে ভীরুচিত ব্যাধ ; সে মৃগেন্দ্র যবে
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে !

কি না তুমি জান রাজা ? কি কব তোমারে ?
জানিয়া শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল ৯০
আত্মশ্লাঘা, মহারথি ? হায় রে কি পাপে,
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির,—হে বিধাতঃ !—পার্থের সমীপে ?
কোথা বীরদর্প তব ? মানদর্প কোথা ?
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে ? ৯৫
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু
দাবানলে ? কোকিলের কাকলী-লহরী
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে ?
ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাহু ?

কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা। গুরুজন তুমি ; ১০০
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীনা ! নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা ! দুরন্ত ফাল্গুনি
(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে ১০৫
বিশ্বসুখ !) নিঃসন্তানা করিল আমারে !
তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি ! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে ?
হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে ! এ পোড়া ললাটে ১১০

লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে!—
হা প্রবীর! এই হেতু ধরিনু কি তোরে,
দশ মাস দশ দিন নানা যত্ন সয়ে,
এ উদরে? কোন্ জন্মে, কোন্ পাপে পাপী
তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি বাছা, ১১৫
এ তাপ? আশার লতা তাই রে ছিঁড়িল?
হা পুত্র! শোধিলি কি রে তুই এইরূপে
মাতৃধার? এই কি রে ছিল তোর মনে?—
কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস্ আজি
বারিধারা? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে? ১২০
কেন বা জ্বলিস্, মনঃ? কে জুড়াবে আজি
বাক্য-সুধারসে তোরে? পাণ্ডবের শরে
খণ্ড শিরোমণি তোর; বিবরে লুকায়ে,
কাঁদি খেদে, মর্, অরে মণিহারা ফণি!—
যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে ১২৫
নব মিত্র পার্থ সহ! মহাযাত্রা করি
চলিল অভাগা জনা পুত্রের উদ্দেশে!
ক্ষত্র-কুলবালা আমি; ক্ষত্র-কুল-বধূ;
কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য্য ধরি?
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে; ১৩০
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্তনগরে
লভি অন্তে! যাচি চির বিদায় ও পদে!
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, "কোথা জনা" বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা?" বলি! ১৩৫

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে জনা-পত্রিকা নাম
একাদশ সর্গ।

পরিশিষ্ট

[বীরাঙ্গনা কাব্য ২১ খানি পত্রিকা বা সর্গে সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা মধুসূদনের ছিল, ১১ খানি পত্রিকা প্রকাশ করিবার পর তিনি আরও কয়েকটি পত্রিকা রচনায় হাত দিয়াছিলেন। কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ হয় নাই। সেই অসম্পূর্ণ পত্রিকাগুলি নিম্নে মুদ্রিত হইল।]

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী

জন্মান্ধ নৃমণি! তুমি, এ বারতা পেয়ে
দূতমুখে, অন্ধা হ'লো গান্ধারী কিঙ্করী
আজি হ'তে। পতি তুমি; কি সাধে ভুঞ্জিব
সে সুখ, যে সুখভোগে বঞ্চিলা বিধাতা
তোমারে, হে প্রাণেশ্বর! আনিতেছে দাসী
কাপড়, ভাঁজিয়া তাহে, সাত বার বেড়ি
অন্ধিব এ চক্ষু দুটি কঠিন বন্ধনে,
ভেজাইব দৃষ্টি-দ্বারে কবাট। ঘটিল,
লিখিলা বিধি যা ভালে—আক্ষেপ না করি;
করিলে ত্যজিব কেন রাজ-অট্টালিকা,
যাইতে যথায় তুমি দূর হস্তিনাতে?
দেবাদেশে নরবর বরেছি তোমারে!

*　　*　　*　　*

আর না হেরিবে কভু দেব বিভাবসু
তব বিভারাশি দাসী এ ভবমণ্ডলে;
তুমিও বিদায় কর, হে রোহিণীপতি,
চারুচন্দ্র; তারা-বৃন্দ তোমরা গো সবে।
আর না হেরিব কভু সখীদলে মিলি
প্রদোষে তোমা সকলে রশ্মিবিম্ব যেন
অম্বরসাগরে, কিন্তু স্থিরকান্তি; যবে
বহেন মলয়ানিল গহন বিপিনে

বাসুকির ফণারূপ-পর্য্যঙ্কে সুন্দরী—
বসুন্ধরা, যান নিদ্রা নিঃশ্বাসি সৌরভে।
হে নদ তরঙ্গময়, পবনের রিপু
(যবে ঝড়াকারে তিনি আক্রমেন তোমা)
হে নদি, পবনপ্রিয়া, সুগন্ধের সহ
তোমার বদন আসি চুম্বেন পবন,
হে উৎস গিরি-দুহিতা জননী মা তুমি ;
নদ, নদী, আশীর্ব্বাদ কর এ দাসীরে।
গান্ধার-রাজনন্দিনী অন্ধা হলো আজি।
আর না হেরিবে কভু হায় অভাগিনী
তোমাদের প্রিয়মুখ। হে কুসুমকুল,
ছিনু তোমাদের সখী, ছিনু লো ভগিনী,
আজি স্নেহহীন হয়ে ছাড়িনু সবারে ;
স্নেহহীন এ কি কথা ? ভুলিতে কি পারি
তোমা সবে ? স্মৃতিশক্তি যত দিন রবে
এ দেহে, স্মরিব আমি তোমা সবাকারে।

অনিরুদ্ধের প্রতি উষা

বাণ-পুরাধিপ বাণ-দানব-নন্দিনী
উষা, কৃতাঞ্জলিপুটে নমে তব পদে,
যদুবর! পত্রবাহ চিত্রলেখা সখী—
দেখা যদি দেহ, দেব, কহিবে বিরলে।
প্রাণের রহস্যকথা প্রাণের ঈশ্বরে !

অকূল পাথারে নাথ, চিরদিন ভাসি
পাইয়াছি কূল এবে! এত দিনে বিধি
দিয়াছেন দিন আজি দীন অধীনীরে!
কি কহিনু ? ক্ষম দেব, বিবশা এ দাসী
হরষে, সরসে যথা হাসে কুমুদিনী,
হেরিয়া আকাশদেশে দেব নিশানাথে
চিরবাঞ্ছা ; চাতকিনী কুতুকিনী যথা

মেঘের সুশ্যাম মূর্ত্তি হেরি শূন্যপথে।
তেমতি এ পোড়া প্রাণ নাচিছে পুলকে,
আনন্দজনিত জল বহিছে নয়নে।
দিয়াছি আদেশ নাথ সঙ্গিনী-সমূহে,
গাইছে মধুর গীত, মিলি তারা সবে
বাজায়ে বিবিধ যন্ত্র। উষার হৃদয়ে
আশালতা আজি উষা রোপিবে কৌতুকে
শুন এবে কহি দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী।

যযাতির প্রতি শর্ম্মিষ্ঠা

দৈত্যকুল-রাজবালা শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী
বলিতে সোহাগে যারে, নরকুল রাজা
তুমি, হে যযাতি, আজি ভিখারিণী হ'ল,
ভবসুখে ভাগ্যদোষে দিয়া জলাঞ্জলি।
দাবানলে দগ্ধ হেরি বন-গৃহ, যথা
কুরঙ্গী শাবক সব সঙ্গে লয়ে চলে,
না জানে আবার কোথা আশ্রয় পাইবে।
হে রাজন্! শিশুত্রয় লয়ে নিজ সাথে
চলিল শর্ম্মিষ্ঠা-দাসী কোথায় কে জানে
আশ্রয় পাইবে তারা? মনে রেখ তুমি।
নয়নের বারি পড়ি ভিজিতে লাগিল
আঁচল, বুঝিয়া তবু দেখ প্রাণপতি,
কে তুমি, কে আমি নাথ, কি হেতু আইনু
দাসীরূপে তব গৃহে রাজবালা আমি?
কি হেতু বা থেকে গেনু তোমার সদনে,
দৈত্যকুল-রাজবালা আমি দাসীরূপে।

নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী

আর কত দিন, সৌরি, জলধির গৃহে
কাঁদিবে অধিনী রমা, কহ তা রমারে।

না পশে এ দেশে নাথ, রবিকররাশি,
না শোভেন স্থধানিধি স্থধাংশু বিতরি ;
স্থিরপ্রভা ভাবে নিত্য ক্ষণপ্রভা রূপী।
বিভা, জন্মি রত্নজালে উজলয়ে পুরী।
তবুও, উপেন্দ্র, আজ ইন্দ্রিরা দুঃখিনী।
বাম দামোদর ; তুমি লয়েছ হে কাড়ি
নয়নের মণি তার পাদপদ্ম তব।
ধরি এ দাসীর কর ও কর-কমলে
কহিলে দাসীরে যবে হে মধুরভাষী,
"যাও প্রিয়ে, বৈনতেয় কৃতাঞ্জলিপুটে—
দেখ দাঁড়াইয়া ওই ; বসি পৃষ্ঠাসনে
যাও সিন্ধুতীরে আজি।" হায়! না জানিনু
হইনু বৈকুণ্ঠচ্যুত দুর্ব্বাসার রোষে।

নলের প্রতি দময়ন্তি

পঞ্চ দেবে বঞ্চি সাধে স্বয়ম্বর-স্থলে
পূজিল রাজীব-পদ তব যে কিঙ্করী,
নরেন্দ্র, বিজন বনে অর্দ্ধ বস্ত্রাবৃতা
ত্যজিলে তুমি হে যারে, না জানি কি দোষে,
নমে সে বৈদর্ভী আজি তোমার চরণে।

গ্রন্থ সমাপ্ত

আলোচনী

১। কবি-পরিচয়

যুগস্রষ্টা কবি মাইকেল মধুসূদন ঊনবিংশ শতকে নবযুগের উদ্বোধনের বাণী বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। ইংরাজী ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫-এ জানুয়ারী মধুসূদনের জন্ম। জন্মভূমি—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলানিকেতন যশোহর নগর হইতে আটাশ মাইল দক্ষিণে কপোতাক্ষ নদীর তীরবর্তী—সাগড়দাঁড়ী গ্রাম। যে বংশে মধুসূদনের জন্ম তাহা খুব সম্ভ্রান্ত বংশ। মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ব্যবহারশাস্ত্রে খুব পারদর্শী ছিলেন এবং তখনকার দিনে কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের একজন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পার্সী ভাষায় সুন্দর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন বলিয়া রাজনারায়ণ দত্ত 'মুন্সী রাজনারায়ণ' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। পিতার বিদ্যানুরাগ, সহৃদয়তা, বুদ্ধিমত্তা, এবং বাক্‌পটুতা মধুসূদন শৈশবেই লাভ করেন। মধুসূদনের মাতার নাম জাহ্নবী দেবী। মাতাপিতার তিনি ছিলেন একমাত্র সন্তান। রাজনারায়ণ কলিকাতায় খিদিরপুরে বাস করিতেন।

মধুসূদন প্রথমে সাগরদাঁড়ীতে মাতার নিকট থাকিয়া পাঠশালায় পড়াশুনা করেন। গ্রামের এক মৌলবীর কাছে তিনি পার্সী শিক্ষাও করিতেন। শৈশবেই তাঁহার বিদ্যানুরাগে সকলে চমৎকৃত হইত। পাঠশালায় তিনি সকলের উপরে ছিলেন। পাঠ্য-পুস্তক ব্যতীত মধুসূদন শৈশবেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত পড়িয়া বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে শুনাইতেন। রামায়ণ-মহাভারতের রসে তিনি বাল্যকাল হইতেই মুগ্ধ ছিলেন। এই রামায়ণ-মহাভারতের রস তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার রক্তের সহিত এমনই নিবিড়ভাবে মিশিয়া গিয়াছিল যে, বিজাতীয় ধর্মগ্রহণের পরও সাধারণ কথাবার্তায় এবং চিঠিপত্রে রামায়ণ-মহাভারতের উপমা আনিয়া ফেলা মধুসূদনের স্বভাবসিদ্ধ ছিল। রাজনারায়ণ পুত্রকে ইংরেজি-শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আনিয়া প্রথমে খিদিরপুরের ইংরেজি বিদ্যালয়ে, পরে হিন্দু-কলেজে ভর্তি করিয়া দিলেন। মধুসূদনের বয়স তখন তের বৎসর। কলেজে প্রবেশ করিয়াই মধুসূদন একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এই হিন্দু-কলেজই তখনকার দিনে ইংরেজি শিক্ষালাভের শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন ছিল। বঙ্গগৌরব ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মধুসূদনের সহপাঠী ছিলেন।

মধুসূদন হিন্দু-কলেজের মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। ইংরেজিতে তাঁহার রীতিমত অধিকার জন্মিয়াছিল। তাঁহার সহপাঠী ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, ইংরেজি-সাহিত্যে সেই সময় কোন ছাত্রই মধুসূদনের সমকক্ষ ছিল না। এই সময় হইতেই তাঁহার কাব্যশক্তির স্ফুরণ হইতে থাকে। নির্ভুল ইংরেজি কবিতা লিখিয়া তিনি কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডসন সাহেবকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থায় মধুসূদন বাংলাভাষার কিছুমাত্র অনুশীলন ত করেন নাই-ই, বরং বাংলাভাষা অশিক্ষিতের ও বর্বরের ভাষা বলিয়া মন্তব্য করিতেন। তিনি বোধ হয় এই সময়ে স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, এই অশিক্ষিতের ও বর্বরের ভাষাতেই একদিন মহাকাব্য রচনা করিয়া তিনি অমরত্ব লাভ করিবেন। হিন্দু-কলেজে পড়িবার সময়ই মধুসূদন একদিকে যেমন ইংরেজী-সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন, অন্য দিকে তেমনি সাহেবিয়ানার অনুকরণেও সবিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠেন। এই ব্যগ্রতাই তাঁহাকে একদিন হিন্দুসমাজের বাহিরে লইয়া গেল। মধুসূদন যখন হিন্দু-কলেজের সিনিয়র বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় তাঁহার মাতাপিতা তাঁহার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এ বিবাহে মধুসূদনের মত ছিল না। শুধু মত ছিল না নহে, তিনি বিবাহ হইতে অব্যাহতি-লাভের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ ছাড়া, বিলাত যাইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও এই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে বলবৎ হইয়া উঠিয়াছিল। মধুসূদন ভাবিলেন খৃস্টান হইতে পারিলে বিবাহের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে এবং বিলাত গমনেরও সুবিধা হইতে পারে। অবশেষে মধুসূদন একদিন কাহাকেও না জানাইয়া সত্যই খৃস্টান হইয়া গেলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ওল্ড মিশন্ চার্চে তিনি খৃস্টধর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষিত হইলেন। খৃষ্টান হইবার পর মধুসূদনের হিন্দু-কলেজে পড়িবার আর অধিকার রহিল না ; গৃহে ও সমাজে থাকিবারও অধিকার রহিল না। একমাত্র পুত্রের এই আচরণে রাজনারায়ণ দত্ত মর্মাহত হইলেন। কিন্তু ধর্মান্তর গ্রহণ করিলেও মধুসূদন মাতা-পিতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হন নাই। তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেন, ইহাই তাঁহার পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল।

সেই সময় ইংরেজ ও ভারতীয় খৃষ্টান যুবকদিগের উচ্চশিক্ষার জন্য শিবপুরে বিশপস্ কলেজ ছিল। খৃস্টান হইবার পর মধুসূদন ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে এই কলেজে ভর্তি হইলেন। রাজনারায়ণ পুত্রের উচ্চশিক্ষার জন্য সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। মধুসূদন তিন বৎসর এই কলেজে পড়িয়াছিলেন। এখানে তিনি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে গ্রীক, লাতিন ও সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু বেশী

দিন মধুসূদনের বিশপস্ কলেজে থাকিয়া পড়াশুনা করা সম্ভব হইল না। কারণ তাঁহার পিতা কিছুকাল বাদে অর্থসাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

পিতার অর্থসাহায্যে বঞ্চিত হইয়া মধুসূদন মাতাপিতা বা বন্ধু-বান্ধব কাহাকেও না জানাইয়া একদিন ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্বেষণে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মাদ্রাজ চলিয়া যান। গৃহত্যাগী, সমাজত্যাগী মধুসূদন এখন একেবারে দেশত্যাগী হইলেন। মাদ্রাজে আসিয়া তিনি শিক্ষকতা করিয়া ও সংবাদপত্রাদিতে লিখিয়া যথাসম্ভব অর্থ উপার্জন করিতে লাগিলেন। এইসব কার্যের অবসরে মধুসূদন কাব্যচর্চা করিতেন। তাঁহার এই কাব্যপ্রচেষ্টার ফল 'ক্যাপটিভ লেডি' এবং 'ভিসন্স্ অব্ দি পাসট্' নামক দুইখানি ইংরেজি কবিতাপুস্তক মধুসূদনকে স্বল্পকাল মধ্যে মাদ্রাজের ইংরেজ সুধীসমাজে সুপরিচিত করিয়া তুলিল।

মাদ্রাজে থাকিতেই মধুসূদন যে স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন সেই স্কুলের রেবেকা-নাম্নী এক ইংরেজ ছাত্রীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ স্থায়ী হয় নাই। কয়েক বৎসর পরেই এই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া, তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের এক ফরাসী অধ্যাপকের কন্যা কুমারী হেনরিয়েটাকে বিবাহ করেন। এই ফরাসী মহিলাই মধুসূদনের সুখদুঃখে আমরণ তাঁহার জীবনসঙ্গিনী ছিলেন। মধুসূদন যখন মাদ্রাজে, সেই সময় তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হয়। মধুসূদনের অন্তরঙ্গ বন্ধু গৌরদাস মধুসূদনকে দেশে ফিরিতে যেমন বারংবার অনুরোধ করিতেন, তেমনি তাঁহার রচিত ইংরেজি কবিতাগুলি পড়িয়া প্রীত হইলেও মাতৃভাষায় কাব্যচর্চা করিবার জন্যও অনুরোধ করিতেন। বন্ধুদের অনুরোধে, তিনি অবশেষে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া মধুসূদন প্রথমে পুলিশ কোর্টে কেরানীর কাজ এবং পরে দোভাষীর চাকরী লইলেন। পুলিশ কোর্টে কার্যকালে মধুসূদন সদর আইন-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এই সময়ে মধুসূদন বেলগাছিয়া নাট্যশালার সংস্পর্শে আসেন। পাইকপাড়া রাজাদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখনকার খ্যাতনামা নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন (নাটুকে রামনারায়ণ) রচিত রত্নাবলী-নাটক এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়। নিমন্ত্রিত ইংরেজ দর্শকগণের জন্য মধুসূদন এই নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন এবং পারিশ্রমিক-স্বরূপ পাঁচশত টাকা পাইয়াছিলেন। এই নাটকের অনুবাদ করিবার সময় মধুসূদনের মনে বাংলাভাষায় নাটক লিখিবার সঙ্কল্প জাগে। এ ছাড়া, সমসাময়িক যাত্রাগানের কদর্যতা ও নাটকের তুচ্ছতা দেখিয়া তিনি সম্ভবতঃ

নাটক লিখিবার প্রেরণা পাইয়া থাকিবেন। তিনি বাংলায় নাটক-লিখিবেন, একথা তখন তাঁহার বন্ধুদের কেহই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন সত্যসত্যই মধুসূদন 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক লিখিলেন তখন তাঁহার বাংলারচনা বন্ধুদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিল। শুধু তাহাই নহে, সে সময়ে যে কয়খানি বাংলা নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শর্ম্মিষ্ঠা নাটকই শ্রেষ্ঠ বলিয়া তখনকার বিদ্বৎসমাজে বিবেচিত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে এই শর্ম্মিষ্ঠা-ই বাংলাভাষায় প্রথম ভাল নাটক। শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের সাফল্যমণ্ডিত অভিনয় মধুসূদনকে নাট্যকারের খ্যাতি আনিয়া দিল। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সকলেই মুক্তকণ্ঠে শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের প্রশংসা করিলেন। কলিকাতার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত জনগণ প্রথম অভিনয় রজনীর দিন উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ইহার প্রশংসা করেন। পাইকপাড়ার রাজাদের নিকট হইতে এই নাটক লিখিয়া মধুসূদন প্রচুর অর্থসাহায্যও লাভ করিয়াছিলেন।

একখানি নাটক লিখিয়াই মধুসূদনের মাতৃভাষায় অনুরাগ জন্মিল। 'পদ্মাবতী' নামে তিনি আর একখানি নাটক অন্য একটি নাট্য-সম্প্রদায়ের জন্য লিখিলেন। তাহার পর রাজাদের অনুরোধে মধুসূদন পর পর দুইখানি প্রহসন লিখিয়া ফেলিলেন —'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা'। বাস্তবধর্মী এই প্রহসন দুইখানির মধ্য দিয়াই বাংলাসাহিত্যে বাস্তবতার আমদানী হয় এবং "বাংলা প্রহসনের আদর্শ ধরিয়া বই দুইটিকে নিখুঁত বলা চলে।" তাহার পর মধুসূদন নাট্যাচার্য কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধে রাজস্থানের ইতিবৃত্ত অবলম্বনে 'কৃষ্ণকুমারী' নামে একখানি বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেন। এই নাটকে কবির স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধ স্পষ্ট করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। দীনবন্ধু মিত্রের সুপ্রসিদ্ধ 'নীলদর্পণ-নাটক'-এর ইংরেজি অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন। ইহার পর নাট্যকার মধুসূদনের ভিতর হইতে কবি মধুসূদনের বিস্ময়কর আবির্ভাব ঘটিয়া বাংলাসাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিল।

নাটকরচনায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন করা মধুসূদনের একান্ত ইচ্ছা ছিল। বাংলা-ভাষায় Blank Verse অর্থাৎ অমিত্রচ্ছন্দ রচিত হইতে পারে কি না এই লইয়া যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার আলোচনা হয়। বাংলাভাষা এই ছন্দের উপযোগী নহে, ইহাই ছিল যতীন্দ্রমোহনের সুদৃঢ় ধারণা; কিন্তু ততোধিক দৃঢ়তার সহিত বঙ্গের ভাবী মহাকবি মধুসূদন বলিয়াছিলেন যে, সংস্কৃতভাষা যাহার জননী সেই বঙ্গভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের চলন কখনই অসম্ভব নহে। তখন মহারাজা বাজি ফেলিলেন যে,

মধুসূদন যদি সত্যসত্যই এই ছন্দে কাব্য রচনা করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করিবেন। বাংলাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দপ্রবর্তনের ইহাই আদি পর্ব। তাহার পর মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' রচনা করেন। বন্ধুরা সকলে চমৎকৃত হইলেন—তাঁহাদের মনে হইল ইহা তো রচনা নহে, ইহা যে সৃষ্টি। বাংলাভাষায় এই নূতন ছন্দের প্রবর্তন মধুসূদনের অদ্বিতীয় কীর্তি। বাংলাসাহিত্যে যেন একটি নবযুগের সূচনা হইল। কলিকাতার সমগ্র শিক্ষিত সমাজ একবাক্যে মধুসূদনের কবিত্বের প্রশংসা করিল।

এই প্রসঙ্গে একজন আধুনিক সমালোচক বলেন: "বাংলায় নাটক এবং কাব্য রচনা করিতে মধুসূদন যে অন্তরের জরুরি তাগিদ বা কোন বিশেষ প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন তাহা নয়। বাংলা নাট্যের কদর্যতা দেখিয়া তাঁহার রসজ্ঞ শিল্পী মানস পীড়া বোধ করিয়াছিল, তাই তিনি নাটক রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহাও অনেকটা বাহাদুরির লোভে এবং জেদ করিয়া। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে যেন বাজি রাখিয়া মধুসূদন বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ চালাইতে ঝোঁক ধরিয়াছিলেন। এই ঝোঁকের ফল বাংলাকাব্যে যুগান্তর সংঘটন। ভাবে ও ভাষায় বাংলা নূতন কবিতার সহিত পুরানো কবিতার বেশ পার্থক্য আছে অস্বীকার করি না, কিন্তু তাহাতে নূতন-পুরাতনের মধ্যে যোগসূত্র সর্বত্র বিচ্ছিন্ন হয় নাই। শুধু পয়ারের বাঁধ ভাঙাই প্রবীণ ও নবীন কাব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট বিদারণ-রেখা টানিয়া দিয়াছে। চৌদ্দ-অক্ষরের বিরাম-যতিকে অস্বীকার করিয়া মধুসূদন পয়ারকে প্রবহমানতায় মুক্তি দিয়াই নবীন কবিতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন।"

ইহার পরেই (১৮৬১) মধুসূদন তাঁহার অমর মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ' লিখিলেন। এই 'মেঘনাদবধ'ই নবযুগের কাব্যসাহিত্য-ক্ষেত্রে মধুসূদনের অক্ষয়-কীর্তিস্তম্ভ-স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। মেঘনাদবধ কাব্য অচিরেই কবিকে খ্যাতির স্বর্ণ-সিংহাসনে বসাইল; বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিকে প্রকাশ্যে সম্বর্ধনা করা হইল। মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশের অল্পদিন পরেই মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা' নামে দুইখানি গীতিকাব্য রচনা করেন। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের মাধুর্য বীরাঙ্গনা কাব্যে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ইহার পরই কবির জীবনের ধারা স্বতন্ত্র পথে প্রবাহিত হয়। তিনি বিলাত যাইবেন, ব্যারিষ্টার হইবেন—এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাঁহার কাব্যজীবনে পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দেয়। তাঁহার সমগ্র কবিজীবন চারিবৎসর কালের বেশী নহে এবং এই স্বল্পকাল মাত্র বঙ্গসাহিত্যে ব্রতী হইয়া মধুসূদন তিনখানি নাটক,

দুইখানি প্রহসন, দুইখানি কাব্য, একখানি পত্রিকাকাব্য ও একখানি গীতিকাব্য রচনা করিয়া অক্ষয় যশের অধিকারী হইয়াছেন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি মধুসূদন বিলাত-যাত্রা করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার পত্নী ও পুত্রকন্যাসহ বিলাতে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। নিজ পৈতৃক সম্পত্তি হইতে নিয়মিতরূপে অর্থপ্রাপ্তির যে ব্যবস্থা মধুসূদন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে সে বিষয়ে নানা গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। ফলে প্রবাসে কবি দারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে পড়েন। বিব্রত মধুসূদনকে কিছুদিনের জন্য আইন পড়া স্থাগিত রাখিতে হইল। ঋণ করিয়া, গৃহসজ্জার উপকরণ বন্ধক দিয়া অতি কষ্টে তাঁহার কিছুকাল কাটে। তাহার পর আবার ঋণ করিতে হইল। সেই মহাসঙ্কটের দিনে মধুসূদন অবশেষে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরকে তাঁহার বিপদের কথা জানাইলেন। বিপন্ন মধুসূদনকে বিদ্যাসাগর উদ্ধার করিলেন, নতুবা য়ুরোপের মত স্থানে অর্থাভাবে কবির যে কি দুর্দশা হইত, তাহা ভাবিতেও পারা যায় না।

য়ুরোপে থাকিবার সময়ও মধুসূদনের ভাষাশিক্ষা ও কাব্যচর্চার বিরাম ছিল না। এই সময়ই তিনি জার্মান ভাষা ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করেন। ফরাসী ভাষাও তিনি কিছু আয়ত্ত করেন। এই সময় তিনি চতুর্দশপদী কবিতাবলী অর্থাৎ সনেট রচনা করেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ন্যায়, সনেটও মধুসূদনই সর্বপ্রথম বাংলায় প্রবর্তন করেন। এই চতুর্দশপদী কবিতাবলীই মধুসূদনের নির্বাণোন্মুখী কাব্যপ্রতিভার শেষ-শিক্ষা। প্রবাসে আর্থিক ক্লেশের মধ্যে, অনাহারে শূন্যদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ যখন অন্ধকার, সেই দুর্দিনেও মধুসূদনের সাহিত্যচর্চার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ যে কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই—ইহা হইতেই মধুসূদনের কাব্য-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

বিদ্যাসাগরের কৃপায় মধুসূদনের অর্থকষ্ট দূর হইলে, তিনি ইংলণ্ডে আইন পড়িয়া ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া মধুসূদন ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই বৎসর মাত্র তিনি ব্যারিস্টারি করিলেন। অমিতব্যয়ী ছিলেন বলিয়া যাহা উপার্জন করিতেন তাহাতে তাঁহার কুলাইত না। পরে হাইকোর্টে মাসিক হাজার টাকা বেতনে একটি চাকুরী লইলেন। কিন্তু অমিতাচারী ও অমিতব্যয়ী মধুসূদনের সংসারে ইহাতেও স্বচ্ছলতা আসিল না। ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল এবং তিনি রোগে অকর্মণ্য হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহার দারিদ্র্য চরমে উঠিয়াছিল। অর্থের জন্য গৃহের মূল্যবান্ দ্রব্যাদি কখনও বিক্রয় করিতে হইত, কখনও বা দেনার দায়ে নিলাম হইত।

মধুসূদনের আয়ুঃসূর্য ঢলিয়া পড়িল, কাব্য প্রতিভাও ম্লান হইয়া আসিল। বিলাত হইতে ফিরিয়া তাঁহার যে সাহিত্যপ্রচেষ্টা তাহা নিতান্ত স্বল্প ও ক্ষীণ। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা 'হেক্‌টর বধ' আখ্যায়িকা ও 'মায়াকানন' নাটক। মায়াকানন প্রকাশিত হইবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ক্রমে কপর্দকহীন হইয়া মধুসূদনকে পরাশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। এই সময় তাঁহার পত্নী হেন্‌রিয়েটাও বিষম জ্বরে শয্যাশায়িনী হইলেন। কবির এই শেষজীবনের কাহিনী যেমন করুণ তেমনি মর্মান্তিক। মুমূর্ষু মধুসূদনকে অবশেষে হাসপাতালে আশ্রয় লইতে হইল। হাসপাতালে তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে লাগিল। এমন সময় তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইল। পত্নী-বিয়োগের তিন দিন পরে হাসপাতালেই মধুসূদন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (২৯শে জুন, ১৮৭৩)। এইভাবে বাংলার অমর কবি, মহাকাব্যের স্রষ্টা ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক মধুসূদনের বিয়োগান্ত জীবনের উপর শেষ যবনিকাপাত হইল।

নিতান্ত স্বল্পকালস্থায়ী কবিজীবনে মধুসূদন বাংলাসাহিত্যে যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। তাঁহার বিস্ময়কর কবিপ্রতিভা-সম্পর্কে সমালোচক স্বকুমার সেন বলেন : "উপমা যদি দিতেই হয় তবে বলিব যে, মধুসূদনের প্রতিভার উপমান সূর্য বা চন্দ্র বা অত্যুজ্জ্বল কোন গ্রহ-নক্ষত্র নয়, তাহা উল্কা।... অকস্মাতের সংঘাতে উল্কা তীব্রতম রশ্মি লইয়া আবির্ভূত হইয়া অকস্মাতের অপর এক সংঘর্ষে নিঃশেষে বিলীন হইয়া যায়। যেটুকু সময় দৃষ্টিগোচর থাকে তাহাতে তাহার প্রখর উজ্জ্বলতা নয়ন ধাঁধিয়া দেয়, আমরা ভাল করিয়া ঠাহর করিতে পারি না। নির্বাপিত হইয়া গেলে তবেই তাহার যথার্থ পরিচয় ধরা পড়ে। মধুসূদনের প্রতিভা সেই রকমই ছিল। কবির জীবৎকালে তাঁহার সৃষ্টির মর্মগ্রাহী বেশি ছিল না। মধুসূদন বাংলায় নূতন কবিতার স্রষ্টা, কিন্তু তাঁহার রচনার সহিত বাংলা-কাব্যের পূর্বাপর-ধারাবাহিকতা নাই। তাঁহার রচনা রসের দিক হইতে স্বতন্ত্র ও অনুর্বর, কিন্তু রূপের দিক দিয়া তাহা সফল ও ধারাবাহী।"

গভীরভাবে অনুশীলন করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মানবতার স্তবগানে মধুসূদনের কাব্য প্রাণবান্ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সৃষ্টি মুখ্যত মানবতার প্রতীক। মানুষের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার কাহিনীকে তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন গভীর সহানুভূতির সহিত। মধুসূদনের পূর্বে বাংলাকাব্যের সুর ছিল মানবতাবর্জিত এবং বাংলাসাহিত্যে এই নূতন সুর তিনি আমদানী করিয়াছেন প্রতীচ্যের সাহিত্য হইতে। সমগ্র মানবসমাজকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ ও উপলব্ধি করিবার দুর্মর আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার কাব্যধর্মকে সৃষ্টিচঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার এই গভীর

বাসনা ও আবেগ রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার প্রতিটি কবিতা ও নাটকে। একজন রূপস্রষ্টা হিসাবেও তিনি ছিলেন অগ্রণী। বাংলা কাব্যসাহিত্যে তিনি এমন এক নূতন রূপের প্রবর্তন করিলেন যাহার সহিত পূর্বেকার আকৃতির যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। তাঁহার সেই বিশেষ রূপ আমাদের ভাষায় ও সাহিত্যে নূতন শক্তি সঞ্চার করিল, আর জাতির প্রাণে জাগাইয়া তুলিল নূতন প্রাণের উদ্যম। এই রূপের আদর্শের উপরে হোমর, মিলটন প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য কবিদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল সত্য ("মধুসূদনের কাব্যগুরু ছিলেন বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, ভার্জিল, কালিদাস, দান্তে, তাসসো এবং মিলটন। ইঁহাদের সকলেরই রচনার কমবেশী প্রভাব তাঁহার কাব্যের উপর পড়িয়াছে।") কিন্তু মধুসূদন তাঁহার পূর্বসূরীদের অনুকারী ছিলেন না। তাঁহাদের অপূর্ব কাব্যরূপে মুগ্ধ হইয়াই সেই রূপটিকে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন মাত্র এবং তাহার দ্বারা ছন্দের একটি প্রশস্ত রাজপথ গড়িয়া তুলিলেন।

মধুসূদনের প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙালির স্তিমিত মনপ্রাণকে সচকিত করিয়া তুলিল। এই ছন্দ প্রবর্তনের সময় তাঁহাকে প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। অতি অল্পসময়ের মধ্যে এই ছন্দের প্রয়োগে 'তিলোত্তমা সম্ভব' ও 'মেঘনাদবধ-কাব্য' লিখিয়া মধুসূদন যুগান্তর আনিলেন। "চৌদ্দ-অক্ষরের বিরাম-যতিকে অস্বীকার করিয়া মধুসূদন পয়ারকে প্রবাহমানতায় মুক্তি দিয়াই নবীন কবিতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন।" এবং সেই সঙ্গে তাঁহার ভাবকল্পনার উপযোগী ভাষা নিজেই গড়িয়া লইলেন। এইভাবে মুহূর্তের মধ্যে কাব্যজগতে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। মধুসূদনের কাব্য-প্রতিভা ছিল অসাধারণ। কিন্তু কবিজীবনের যৌবনে দৃষ্টি ছিল বাহিরের দিকে। দৃষ্টি যদি প্রথম হইতেই অন্তরের দিকে পড়িত, তাহা হইলে কাব্যকলায় মধুসূদনের সৃষ্টি সার্থকতর হইত। তিনি নবীনকে অভ্যর্থনা জানাইতে গিয়া প্রাচীনকে বিস্মৃত হন নাই বা বর্জন করেন নাই। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্ তথ্যগুলি উদ্ঘাটন করিয়া তিনি মানুষকে অগ্রগতির পথ দেখাইয়াছেন। আধুনিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য পরবর্তী কালের কবিগণ তাঁহার নিকট হইতেই অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন। কারণ, বাংলা কবিতাকে আধুনিক যুগের নবীন সাজে সাজাইবার এবং নবীনভাবে ভাবিত করিবার যোগ্যতা তখন আর কাহারো ছিল না।

বাংলাসাহিত্যে বিয়োগান্ত কাব্য বা ট্রাজেডি ছিল না। 'মেঘনাদবধ-কাব্য' লিখিয়া মধুসূদন ইহার সূচনা করেন। আমাদের দেশে সংস্কৃত সাহিত্যেও ইহার অস্তিত্ব ছিল না। গ্রীক নাটকেই প্রথমে ট্রাজেডির উৎপত্তি হয়, তাহার পর

রেনেশাঁস যুগে ইহা রোমক সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমগ্র য়ুরোপে ছড়াইয়া পড়ে। শিল্প ও জীবনের দিক হইতে এই ট্রাজেডির মূল্য অসীম। মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য হইতেই বাংলা কাব্যসাহিত্যে ট্রাজেডির আমদানি করিয়াছিলেন। "গ্রীক ট্রাজেডিতে দৈবের যে অলঙ্ঘনীয়তা ওতপ্রোত দেখি, তাহা মধুসূদন নিজের জীবনের মধ্যেও অনুভব করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার কাব্যে এবং নাটকে প্রাক্তনের অনিবার্যতার উপর প্লটের ভারকেন্দ্র স্থাপিত।" তাহার উপর এ্যারিষ্টটল্ ও সেক্সপীয়রের প্রভাবও সুস্পষ্ট।

মধুসূদনের কাব্যপ্রতিভার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল তাঁহার মানবতাবাদ। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে তাহার নিদর্শন সুস্পষ্ট। মিলটন তাঁহার প্যারাডাইস লস্ট-এ যে স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন, মধুসূদনও তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে তাহাই করিয়াছেন। ইহা মিলটনের প্রভাব নহে—যুগধর্মেরই প্রভাব। বস্তুত, তাঁহার রচনার পশ্চাতে রহিয়াছে যুগধর্মের প্রতিফলন। পাশ্চাত্ত্যে তখন দেখা দিয়াছে বিরাট পরিবর্তনের তরঙ্গ। সেখানে জাতিতে-জাতিতে, বর্ণে-বর্ণে ভেদাভেদের তখন অবসান হইয়াছে। আবার রুশোর সাম্যবাদ ও ফরাসী বিপ্লবের উন্মাদিনী শক্তি গভীরভাবে মানুষের মনকে নাড়া দিয়াছে। তাই মধুসূদন তাঁহার কাব্যকে দেবদেবীর স্তুতিগান হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে মানবতার জয়গানে মুখরিত করিলেন। সেইদিন হইতে বাংলাকাব্যের মোড় ঘুরিয়া গেল।

এইভাবে কাব্যে, নাটকে, প্রহসনে, ছন্দে ও ভাষায় তাঁহার দান নব্য-বাংলা-সাহিত্যকে উর্বর করিয়া তুলিয়াছে। একটি দুর্দমনীয় আবেগে তিনি সাহিত্যে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাই তিনি যুগস্রষ্টা মহাকবি। এই আবেগের প্রচণ্ডতা এমনি যে, কোনো বাধা মানে নাই—না ভাষা ও ছন্দের স্বাভাবিক বাধা, না সামাজিক পরিবেশের বাধা। তাঁহারই আদর্শের অনুসরণে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি নূতন কালের ধর্মকে স্বীকার করিয়া সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। এই ভাবে নবযুগের অগ্রদূত মধুসূদন আপন পরিপূর্ণতার দ্বারাই আপনাকে সার্থক করিয়াছেন। তিনি যে নূতন আলো জ্বালাইয়াছেন, সেই সদা-প্রদীপ্ত দীপশিখার মধ্যেই তাঁহার কাব্যসৌধ আলোকিত হইয়া আছে।

২। বীরাঙ্গনা কাব্যের ভূমিকা

মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' বাংলাসাহিত্যের প্রথম ও শেষ পত্রকাব্য। মেঘনাদবধ কাব্যে যেমন মাইকেল প্রতিভার গম্ভীর এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্যে যেমন তাহার কোমল অংশের পরিস্ফুটন হইয়াছে, বীরাঙ্গনা কাব্যে তেমনই এই উভয়ের সম্মিলন হইয়াছে। এই কাব্যে আমরা একদিকে পাই মেঘনাদবধের গাম্ভীর্য আর অন্য দিকে পাই ব্রজাঙ্গনার মাধুর্য। তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের পর মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করিয়াও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে মধুসূদনের শেষ কথা বলা হয় নাই; অর্থাৎ ভাষার গাম্ভীর্য, যতি ও ছন্দের বৈচিত্র্যের দিক দিয়া যে আরও পরিণতির অবকাশ ছিল, মধুসূদন তাহা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তিনি তাঁহার বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর অনুরোধে সিংহবিজয় নামক একখানি কাব্যরচনায় হাত দিয়াছিলেন। সম্ভবত উক্ত আখ্যান-বর্ণনামূলক কাব্যে অমিত্র-চ্ছন্দের পরিণতি প্রদর্শনের সুযোগ না পাইয়াই মধুসূদন তাহা পরিত্যাগ করেন, এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল নাটকীয় বিষয়বস্তুর প্রয়োজন অনুভব করেন।

ইতালীয় কাব্যসমুদ্রে অবগাহন কালে তিনি রোমক কবি ওবিদ প্রণীত *Heroic Epistles* বা বীরপত্রাবলী কাব্যের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ওবিদ এই কাব্যে পুরাণ-কাহিনীর নায়িকাদের সম্পূর্ণ নূতন ও রোমান্টিক মূর্তিতে সজ্জিত করিয়াছেন। পত্রাকারে নায়িকাদের চিত্ত-উদ্ঘাটনের এই আদর্শেই মধুসূদন তাঁহার বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা করেন। ওবিদের বীরপত্রাবলীর ন্যায় বীরাঙ্গনা কাব্যও প্রসিদ্ধ পৌরাণিক নায়িকাদের পত্রচ্ছলে গঠিত এবং পতিপরায়ণা সাধ্বীর, কলঙ্কিনী প্রেমিকার, এবং অভিমানিনী সতীর হৃদয়োচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ।

এই কাব্যরচনা সম্পর্কে মধুসূদন ১৮৬১ খৃস্টাব্দে এক চিঠিতে রাজনারায়ণকে লিখিতেছেন: "...গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে 'বীরাঙ্গনা' নামে একটি বস্তু কলমের আঁচড়ে খাড়া করিয়াছি; প্রসিদ্ধ পৌরাণিক নারীরা তাঁহাদের প্রণয়ী অথবা পতিদের নিকট নায়িকার উপযুক্ত লিপি লিখিতেছে—ইহাই 'বীরাঙ্গনা'। সব শুদ্ধ একুশটি পত্র হইবার কথা; আমি এগারটি সম্পূর্ণ করিয়াছি। সবগুলি শেষ করিতে দেরী হইবে বলিয়া এই এগারটি ছাপা হইতেছে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও অন্যান্য দুই একজন বন্ধু ইহা পড়িয়া প্রায় ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। তুমি নিজের বুদ্ধিতে বিচার করিবে।" এই এগারটি পত্রই 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। ইহা ওবিদের *Heroic Epistles*-এর আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।

বীরাঙ্গনা কাব্য অসম্পূর্ণ, অর্থাৎ কবির পরিকল্পিত একুশটি পত্র সম্পূর্ণ রচিত হয় নাই। স্থগিত লেখা তিনি আর ধরিতে পারেন নাই। যদিও পরে কয়েকটি পত্রের

পত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই। কবি নিজেই এক পত্রে রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন: "আমার কাব্যজীবন শেষ হইয়া আসিতেছে।" তাহাই সত্যে পরিণত হইয়াছিল। ওবিদের বীরপত্রাবলীর সহিত বীরাঙ্গনার সাদৃশ্য থাকিলেও ইহাতে মৌলিকতার অভাব নাই। পত্রাকারে কাব্যরচনা যে সম্ভবপর, মধুসূদন তাহাই কেবল ওবিদের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, কোনও স্থলে তাঁহার গ্রন্থের ভাবাপহরণ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেন: "ওবিদের সঙ্গে মধুসূদনের একটা বড় মিল ছিল। ওবিদ যেমন 'Only when writing in the person of a woman.........that he allows himself any approach to tenderness,' মধুসূদনও তেমনি নারীচরিত্র-বর্ণনায় তাঁহার লিরিক ক্ষমতাটুকু উজাড় করিয়া দিয়াছেন। বীরাঙ্গনার ভাব যেমন লিরিক্যাল, ভাষা তেমনি প্রসাদগুণবিশিষ্ট এবং ছন্দও নিরঙ্কুশ, সর্বোপরি আছে নাটকীয়তা। আসলে বীরাঙ্গনার অধিকাংশ কবিতাকে একাত্মক নাট্যকাব্য বা dramatic monologue বলিলে অন্যায় হয় না।"

গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের ন্যায় বীরাঙ্গনার নাম সম্বন্ধেও মধুসূদন ওবিদের অনুসরণ করিয়াছিলেন। 'বীরাঙ্গনা' শব্দটি শুনিবামাত্র আমাদের স্বভাবতঃই রাণী দুর্গাবতী অথবা ঝান্সীর রাণী লক্ষীবাঈ-এর কথা স্মরণ হয়। কিন্তু কবি বীরাঙ্গনা শব্দ এই অর্থে ব্যবহার করেন নাই। সাধ্বী পেনিলোপ, কলঙ্কিনী ক্যানেস এবং প্রেমোন্মাদিনী দিদো, ইহাদিগের প্রত্যেকেরই পত্র ওবিদ বীর-পত্রাবলী নামে অভিহিত করিয়াছেন। মধুসূদনও তাঁহার আদর্শে, কলঙ্কিনী তারা, পতিগতপ্রাণা দেবী রুক্মিণী এবং তেজস্বিনী জনা, ইহাদিগের সকলকেই বীরাঙ্গনা নাম দিয়াছেন। ওবিদের কাব্যগ্রন্থখানির পুরা নাম হইল, *The Heroides or Epistles of the Heroines*, সুতরাং তাঁহার গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও শিরোনামের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা' নামটি নিতান্ত সহজভাবে লইবার উপায় নাই। যেখানে এগারখানি পত্রিকার মধ্যে একমাত্র জনার পত্রিকা ছাড়া আর কোথাও বীররসের প্রাধান্য নাই, সেখানে 'বীরাঙ্গনা' নামের সার্থকতা কোথায়? মনে হয়, 'বীরাঙ্গনা' কথাটি মধুসূদন তাঁহার স্বভাবসুলভ দুর্বার স্বেচ্ছাক্রমে পাশ্চাত্য 'Heroine' শব্দটির প্রতিশব্দরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। Heroine-এর পরিবর্তে 'নায়িকা' শব্দটি বোধ হয় কবির শ্রুতিতে অরুচিকর ঠেকিয়াছিল, অথচ বেশ বুঝা যায়, তাঁহার লেখনীতে 'বীরাঙ্গনা' আসিলেও তিনি আসলে 'নায়িকা'রই ধ্যান করিয়া চলিয়াছেন। ১৮৬২ খৃস্টাব্দের গোড়ায় ইহা প্রকাশিত হয়। যাঁহার নিকট কবি

আমরণ আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, "বঙ্গকুলচূড়া" সেই মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের "চিরস্মরণীয় নাম-এ" বীরাঙ্গনা কাব্য উৎসৃষ্ট হইয়াছে।

কাব্যখানি প্রকাশিত হইবার পর মধুসূদন এক পত্রে রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেনঃ "নূতন কাব্যটি সদ্য বাহির হইয়াছে, তোমাকে একখণ্ড পাঠাইবার জন্য বলিয়াছি। যত শীঘ্র সম্ভব, ইহার সম্বন্ধে তোমার মতামত জানাইয়া আমাকে বাধিত করিবে, কারণ, কবিতা বিষয়ে অনেকের অপেক্ষা তোমার মতকেই আমি শ্রদ্ধা করিয়া থাকি।...আমাদের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু বিদ্যাসাগরের নামে বইটি উৎসর্গ করিয়াছি। বিশ্বাস কর, এমন চমৎকার মানুষ হয় না। অনেক দিক দিয়া তাঁহাকেই আমি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়া মনে করি।" বিদ্যাসাগরকে গ্রন্থ উৎসর্গ করিবার একটি বিশেষ কারণ আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম প্রথম অমিত্রচ্ছন্দের সৌন্দর্য ধরিতে পারেন নাই। পরে, তিনি ইংরেজীতে অমিত্রচ্ছন্দের আবৃত্তি আয়ত্ত করিয়া, ক্রমে বাংলাকাব্যে ঐ ছন্দ-প্রবর্তনের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। তাই, মধুসূদন এই শেষ কাব্যখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার প্রতি স্বীয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ওবিদের ন্যায় একুশখানি লিপিতেই কাব্যখানি শেষ করিবার ইচ্ছা কবির ছিল, কিন্তু অর্থাভাব, মনশ্চাঞ্চল্য ও ঘটনাচক্রের পরিবর্তনের জন্য কবি এগারখানি পত্রিকার বেশী আর লিখিতেই পারেন নাই।

পত্রাকারে যে কাব্যরচনা করা সম্ভব, এই ধারণার জন্য মধুসূদন যে কেবলমাত্র ওবিদের নিকট ঋণী, এমন কথা ঠিক নয়। মধুসূদন সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য গভীরভাবেই অনুশীলন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে স্থল-বিশেষে নারী-কর্তৃক পতি বা প্রণয়-পাত্রকে পত্র লিখনের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে বিরহবিধুরা শকুন্তলা কর্তৃক দুষ্মন্তকে পত্র লিখিবার কথা আছে। ভাগবতে রুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে পত্র লিখিয়া এক ব্রাহ্মণদ্বারা উহা তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই রকম সংস্কৃতসাহিত্যের নানাস্থানে প্রণয়াস্পদকে নারীর পত্র লিখিবার উল্লেখ আছে। মধুসূদন ইহা জানিতেন বলিয়াই বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদপটে সাহিত্য-দর্পণের এই উদ্ধৃতিটি সন্নিবেশিত করিয়াছিলেনঃ "লেখ্যপ্রস্থাপনৈঃ নার্য্যাভাবাভিব্যক্তিরিষ্যতে।" কিন্তু সংস্কৃতসাহিত্যে এই রকম পত্রের উল্লেখ থাকিলেও, কাব্যবিচারে উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, এমন পত্রিকা নাই বলিলেও হয়। তাই, রোমক-কবি ওবিদের পত্রিকাগুলিই যে মধুসূদনকে একটা তেজস্বী প্রেরণা দিয়াছিল এবং তিনি যে ওবিদের আদর্শেই বাংলায় ঐরূপ কয়েকখানি লিপি—যাহার ভিতর প্রকৃত কাব্য-

মাধুর্য আস্বাদন করা যাইবে—লিখিতে আরম্ভ করেন ইহা অনস্বীকার্য। বীরাঙ্গনা কাব্যে দেশীয় আখ্যায়িকাগুলি নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে বিদেশী কাব্যের রূপ ও রীতির আধারে। বীরাঙ্গনা মধুসূদনের এক সম্পূর্ণ মৌলিক সৃষ্টি।

এই কাব্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন: "মেঘনাদবধের পর বীরাঙ্গনা কাব্যের স্বচ্ছন্দপ্রবাহ আমাদিগকে মুগ্ধ করে। ইহার সর্বত্রই একটি সঙ্গীতধ্বনি ঝঙ্কৃত হইয়া কাব্যখানিকে পরম উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে। কবিত্বশক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' উৎকৃষ্ট; কিন্তু ভাষার লালিত্যে ও ছন্দের পারিপাট্যে মধুকবির বীরাঙ্গনা সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।" সত্যই ইহা মধুসূদনের পরিণত প্রতিভার দান। তিলোত্তমায় যে ছন্দের আবির্ভাব, মেঘনাদবধে যাহার বিকাশ, সেই অমিত্রচ্ছন্দের পূর্ণ পরিণতি আমরা বীরাঙ্গনা কাব্যে দেখিতে পাই। কাব্যের ভাষা ও ছন্দ যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে হয়, তাহাই হইয়াছে—কোথাও ত্রুটির লেশমাত্র নাই; ভাষা সুললিত ও সরল এবং ছন্দ সর্বত্রই মধুর ও সঙ্গীতময়।

বাংলাসাহিত্যে মধুসূদনই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক এবং মধুসূদনের হাতেই যে ইহার চরম পরিণতি, তাহা 'তিলোত্তমা', 'মেঘনাদবধ' ও 'বীরাঙ্গনা'র ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। 'তিলোত্তমা'র ভাষা সকল স্থলে শ্রুতিমধুর হয় নাই, ভাষা কোথাও কোথাও জড়তাগ্রস্ত হইয়া কানকে আঘাত করিয়াছে, ফলে ছন্দ আড়ষ্ট হওয়ায় আবৃত্তি পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়। 'মেঘনাদবধে' আসিয়া দেখা যায় কবি এই সকল দোষ আপন প্রতিভার আলোয় আপনি ধরিয়া ফেলিয়াছেন, এবং অসামান্য উন্নতির পথে তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু চরম পরিণতির জন্য একটি সম্পূর্ণ নূতন প্রয়াসের প্রয়োজন ছিল, আর তাহাই 'বীরাঙ্গনা' রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। 'মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির প্রকাশে অমিত্রচ্ছন্দ যে কতখানি সুন্দর হইতে পারে তাহা মধুসূদন দুইটি স্থানে দেখাইয়াছেন—প্রথম সীতাসরমা-সংবাদে, এবং দ্বিতীয় বীরাঙ্গনার প্রেমপত্রিকাগুলির মধ্যে।'

'বীরাঙ্গনা'র ভাষার অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ হইল ইহার lyrical effect বা গীতিধর্মিতা। এমন করিয়া প্রাণের কথা প্রাণ খুলিয়া বলা, আর যেখানে হউক, অমিত্রচ্ছন্দে যে কিরূপে সম্ভব হইল, তাহাই এক চিরন্তন বিস্ময় বলিয়া গণ্য।

'বীরাঙ্গনা'র ভাষা ও ছন্দসম্পর্কে মধুসূদনের জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। "ভাষার লালিত্যে 'বীরাঙ্গনা' মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দ রচিত মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। শব্দের জটিলতা, দুরূহার্থতা, ক্লিষ্টতা, যতিভঙ্গ

প্রভৃতি যে সমস্ত দোষ 'তিলোত্তমা-সম্ভবে'র সৌন্দর্যহানি করিয়াছে, 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। অনেকের বিশ্বাস, অমিত্রচ্ছন্দ গম্ভীর রচনার এবং বীররসের পক্ষে উপযোগী হইলেও মধুর কোমলভাবের উপযুক্ত নয়। 'বীরাঙ্গনা'র ভাষা তাঁহাদিগের সে ভ্রম দূরীভূত করিবে। 'বীরাঙ্গনা'র ভাষা মধুর অথচ ওজস্বী, প্রাঞ্জল অথচ গম্ভীর, এবং কবির কল্পনা-তরঙ্গের সঙ্গে যেন উত্থান ও পতনশীল। ইংরাজী ভাষায় যিনি অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছিলেন (Wyatt or Surrey), তাহার উৎকর্ষসাধন তাঁহার দ্বারা হয় নাই, তাঁহার পরবর্তী কবিগণের (Milton প্রমুখ) দ্বারাই হইয়াছিল। কিন্তু বাংলাভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন এবং তাহার উৎকর্ষসাধন, এই উভয় গৌরবই মধুসূদনের প্রাপ্য। বীরাঙ্গনা রচনার পর, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বঙ্গের প্রতিভাবান্ লেখকগণ অমিত্রচ্ছন্দে কবিতা লিখিয়াছেন। (কিন্তু তাঁহাদের কাহারও রচনা মধুসূদন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচিত হয় না।)......অসামান্য প্রতিভাগুণে বীররসপ্রধান কবিতার ন্যায় গীতি কবিতাতেও যদিও মধুসূদন কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার স্বভাবত বীরত্বানুরাগী হৃদয় তাঁহার অজ্ঞাতসারে পুনর্বার বীররসের দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল। ললিত পদাবলী সৃজন করিয়া তিনি বিরহবিধুরা শ্রীরাধিকার মর্মবেদনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু 'মেঘনাদবধে' যে গম্ভীর ভেরীনিনাদ একবার তাঁহার হৃদয় হইতে উদ্গত হইয়াছিল 'ব্রজাঙ্গনা'র মোহন বংশীধ্বনিতে তাহা নিমগ্ন হইল না। গোপবালাগণের রোদনধ্বনির মধ্যে, যমুনার কলকল শব্দের অভ্যন্তরে এবং বৃন্দাবনের তমালরাজির মর্মর শব্দে, কোথাও তাহা তাঁহার কর্ণে নিনাদিত হইতে বিরত হইল না। তাঁহার প্রতিভা 'মেঘনাদবধে'র গাম্ভীর্য এবং 'ব্রজাঙ্গনা'র মাধুর্য উভয়ের সম্মিলনে প্রস্তুত হইল ; **ইহারই ফল 'বীরাঙ্গনা'**। বীরাঙ্গনায় সেইজন্য একদিকে বনবাসিনী ঋষিপালিতা শকুন্তলার করুণ আর্তনাদ এবং অপর দিকে বীরপ্রসূতি তেজস্বিনী জনার হৃদয়ভেদী তিরস্কার, উভয়ের সংমিশ্রণ। 'বীরাঙ্গনা', 'মেঘনাদ' ও 'ব্রজাঙ্গনা' এই উভয় কাব্যের সংযোগসূত্র-স্বরূপ এবং মধুসূদনের প্রতিভার গম্ভীর ও কোমল অংশের সম্মিলনস্থল।"

মধুসূদনের কবিত্বের পরিপূর্ণ রূপ বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রতিটি ছত্রে প্রতিফলিত। অমিত্রচ্ছন্দ যেমন মধুসূদনের মৌলিক দান, তেমনি বীরাঙ্গনার গঠনরীতিও এক নূতন দান,—এই রীতি বাংলাসাহিত্যে ইতিপূর্বে আর ছিল না। রসবৈচিত্র্য এই কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি লিপি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে মনোহর—প্রত্যেকটিতে নব নব ভাব পল্লবিত। এক-এক পত্রিকার বিষয়, ভাব ও

রস এক-এক রূপ। কবি আশ্চর্য দক্ষতার সহিত প্রত্যেকটি নায়িকার অন্তর-রহস্য বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাদের প্রেমপূর্ণ জগৎ পাঠকের নিকট খুলিয়া মেলিয়া ধরিয়াছেন। "হৃদয়পাশে বন্দিনী হইয়া যে নারী অদৃষ্টের নির্যাতন সহিতেছে সেই নারীই মধুসূদনের কাব্য-নাটকের নায়িকা।···বীরাঙ্গনায় সব কয়টি নায়িকা অদৃষ্টের ফাঁসে অথবা প্রেমের পাশে বন্দিনী।" আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, কাব্যাংশে এমন পত্রকাব্য বাংলাসাহিত্যে আর নাই।

৩। বীরাঙ্গনা কাব্য-আলোচনা

বীরাঙ্গনা কাব্য একাদশ সর্গে বিভক্ত। এক একটি সর্গ এক একটি লিপি। দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, সোমের প্রতি তারা, দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা, অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী, জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা, শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী, পুরুরবার প্রতি উর্বশী, এবং নীলধ্বজের প্রতি জনা—এই এগারটি লিপিতে কাব্যখানি সম্পূর্ণ। শ্রেণী অনুসারে বিভাগ করিলে, এই পত্রগুলিকে নিম্নলিখিত কয় শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম : প্রেমপত্রিকা ;—প্রেমাস্পদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া প্রেমিকার পত্র। তারা, সূর্পণখা, উর্বশী এবং রুক্মিণীর পত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্বিতীয়ত : প্রত্যাখান-পত্রিকা ;—ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ-মূলক প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য পত্র। জাহ্নবী দেবীর পত্র এই শ্রেণীতে পড়ে। তৃতীয় : স্মরনার্থ পত্রিকা ;—স্বামীর অদর্শনে ব্যাকুলা অথবা স্বামীর অমঙ্গল চিন্তায় উৎকণ্ঠিতা প্রোষিতভর্তৃকার পত্র। শকুন্তলা, দ্রৌপদী, ভানুমতী এবং দুঃশলা এই চারিজন নায়িকার পত্র এই শ্রেণীতে পড়ে। চতুর্থ : অনুযোগ-পত্রিকা ;—স্বামীর অসদৃশ ব্যবহারে মর্মপীড়িতা, তেজস্বিনী রমণীর পত্র ; কৈকেয়ী ও জনার পত্র এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত। সমজাতীয় পদার্থের মধ্যেও যে বৈষম্য বর্তমান থাকে, তাহার পরিস্ফুটন করিয়া যিনি যে পরিমাণে প্রত্যেকটির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহার নৈপুণ্য সেই পরিমাণে প্রশংসনীয়। মধুসূদন, এই সকল সমজাতীয় রমণীদিগকে একত্র করিয়া, তাঁহাদিগের প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য কিরূপে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই আমরা তাঁহার সামর্থ্য বুঝিতে পারিব। মোটামুটি বলিতে গেলে, বীরাঙ্গনা কাব্যের লিপিগুলির প্রমাণ দুইটি বিভাগ করা যাইতে পারে : প্রেমপত্রিকা ও বীর-রসাত্মক পত্রিকা। একমাত্র জনার পত্রখানিই আগাগোড়া বীর-রসাত্মক ; বাকী সবগুলিই প্রণয়পত্রিকা।

প্রথমে আমরা প্রেমপত্রিকাগুলি আলোচনা করিব। বীরাঙ্গনা কাব্যের তারা, সূর্পণখা, উর্বশী এবং রুক্মিণী দেবী, চারিজনেই প্রেমিকা। সুতরাং ইহাদিগের প্রত্যেকেরই লিপিতে প্রেমিক হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও উচ্ছ্বাস সুস্পষ্ট। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইহারা সকলেই প্রেমিকা হলেও ইহাদের অবস্থার পার্থক্য আছে। প্রেমিকা তারা—সধবা; সূর্পণখা—বিধবা; উর্বশী—বারবনিতা এবং রুক্মিণী—কুমারী। নারীজীবনে সাধারণত যে চারি প্রকার অবস্থা হওয়া সম্ভব, এই চারিজনেই আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু এই চারিজনের পত্রে প্রত্যেকেরই চরিত্র ও প্রেম-নিবেদনের পার্থক্য সুন্দরভাবে দেখানো হইয়াছে। কবি যদি তাহা দেখাইতে না পারিতেন তাহা হইলে বীরাঙ্গনা কাব্যের কোনও সার্থকতাই থাকিত না। প্রেম একদিকে যেমন পাত্রাপাত্র বিচার করে না, অপর দিকে তেমনই প্রেমিক-প্রেমিকার অবস্থার উপরও নির্ভর করে না। সেইজন্য তারা, গুরুপত্নী হইয়া, শিষ্যে; সূর্পণখা, রাজসহোদরা হইয়া, জটাজুটধারী সন্ন্যাসীতে; রুক্মিণী দেবী, লজ্জাশীলা কুলবালা হইয়া, অপরিচিত জনে, আত্মসমর্পণের জন্য ব্যাকুলা, আর স্বর্গের অপ্সরী হইয়াও উর্বশী মর্ত্যের মানবের প্রেমে বিমুগ্ধা। তারার ও সূর্পণখার প্রেম রূপজ মোহ হইতে উৎপন্ন, উর্বশীর প্রেমে রূপজ মোহের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা এবং নারীস্বভাবোচিত বীরত্বানুরাগ মিলিয়াছে; কেবল রুক্মিণী দেবীর প্রেমের রূপজ বা ইন্দ্রিয়জ বিকার নাই। যিনি পতিব্রতাধর্মে সীতা ও সাবিত্রীর তুল্যা, এবং পুরাণে যিনি লক্ষ্মীস্বরূপিণী বলিয়া বন্দিতা হইয়াছেন, তাঁহার প্রেম ইন্দ্রিয়বিকারশূন্য এইরূপ দেখাইয়া মধুসূদন নিজের সুরুচিরই পরিচয় দিয়াছেন। প্রত্যেকেরই পত্রে প্রত্যেকের অবস্থা অনুযায়ী ভাব স্বাভাবিক বর্ণে বিচিত্র হইয়াছে। তারার মুখের কথা, উর্বশীর মুখে মানাইত না কিংবা রুক্মিণীর মুখের কথা সূর্পণখার মুখে মানাইত না—যদিও বক্তব্য সকলের এক। ইহা বড় কম কৃতিত্বের কথা নহে।

উর্বশী বীরাঙ্গনা—তাহার লজ্জা ভয় নাই, সমাজনিন্দার জন্য ভয় নাই, হৃদয়ের ভাব যে সংযত রাখা কর্তব্য, সে চিন্তা পর্যন্ত তাহার মনে উদিত হয় না। সে মুক্তকণ্ঠেই নিজের হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে প্রস্তুত। সেইজন্য তাহার পত্রে আমরা দেখিতে পাই:

"কহিনু যে কথা
মুক্তকণ্ঠে কালি আমি দেব-সভাতলে
কহিব সে কথা আজি, কি কাজ সরমে?"

কিন্তু **তারা** ঋষিপত্নী এবং ঋষিদুহিতা—সাময়িক মোহের বশে উন্মার্গগামিনী হইলেও, আজন্মসিদ্ধ সংস্কার পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। দুর্বার ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করা তাঁহার সাধ্য ছিল না, কিন্তু আত্মকৃত এই পাপের জন্য অনুতাপের জ্বালাও তিনি একেবারে এড়াইতে পারেন নাই। তাই পত্রিকার মধ্যে একস্থানে শুনা যায় তারা মানসিক যন্ত্রণায় আপনাকে ও বিধাতাকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছেন ঃ

"হা ধিক্! কি পাপে
হায়রে কি পাপে বিধি, এ তাপ লিখিলি
এ ভালে ; জনম মম মহা-ঋষি কুলে
তবু চণ্ডালিনী আমি।"

সূর্পণখা বালবিধবা—রাক্ষসরাজ রাবণের সহোদরা এবং শৈশব হইতেই রাজপ্রাসাদের ভোগে ও বিলাসে অভ্যস্তা। তাহার হৃদয়ে অনুতাপ নাই, গ্লানি নাই। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, উপযুক্ত পতি পাইলে রাক্ষসরাজ তাহার আবার বিবাহ দিবেন এবং এই কারণে হৃদয়ে সে আশ্বস্তা। আশার জিনিসে যে নৈরাশ্য ঘটিতে পারে, ত্রিভুবনবিজয়ী রাক্ষসরাজের পরিবারবর্গের মধ্যে কাহারও সে অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব নয়। আজন্ম সৌভাগ্যে অভ্যস্তা স্থূর্পণখা প্রত্যাখ্যান কাহাকে বলে তাহা জানিত না ; সেই জন্য প্রিয়তমকে পত্র লিখিবার সময় স্থূর্পণখার হৃদয় অনুরাগের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। ভাবী সুখের প্রত্যাশায় আনন্দাশ্রু তাহার নয়ন হইতে উদ্গত হইতেছিল। স্থূর্পণখা লিখিয়াছিল ঃ

"পত্রে, আনন্দে বহিছে অশ্রুধারা।"

উর্বশী রূপব্যবসায়িনী—নিজের রূপ ও যৌবনই তাহার সর্বস্ব, উর্বশী তাই প্রিয়তমকে রূপযৌবনের প্রলোভন দেখাইয়া লিখিয়াছিল ঃ

"কঠোর তপস্যা নর করি যদি লভে
স্বর্গভোগ ; সর্ব্ব অগ্রে বাঞ্ছে সে ভুঞ্জিতে
সে স্থির-যৌবন-সুধা—অর্পিব তা পদে"

স্থূর্পণখা কাঞ্চনসৌধকিরীটিনী লঙ্কাপুরীর অধীশ্বরের সহোদরা। তাহার ধনজনের অভাব কি? স্থূর্পণখা তাই লিখিয়াছে ঃ

"রথ, গজ, অশ্ব, রথী—অতুল জগতে
... ...
... ... যদি অর্থ চাহ,
কহ শীঘ্র অলঙ্কার ভাণ্ডার খুলিব।"

কিন্তু কুটিরবাসিনী, বল্কলবসনা তারার এ সকল কিছুই ছিল না। তিনি, প্রিয়তমের জন্য কুসুম চয়ন করিয়া, গুরুর প্রসাদ অন্নের সঙ্গে সুমিষ্টদ্রব্য রাখিয়া, আপনার প্রেম ব্যক্ত করিতেন। তারা লিখিয়াছেন ঃ

"ভোজনান্তে আচমন হেতু
যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে
বহির্দ্বারে, কত যে কি রাখিতাম পাতে ?"
চুরি করি আনি আমি পড়ে কি হে মনে ?"

বীরাঙ্গনার পত্রগুলি বিশ্লেষণ করিলে প্রত্যেক স্থলেই কবির এইরূপ নৈপুণ্য লক্ষিত হইবে। তারা, সূর্পণখা ও উর্বশীর পত্রে যে রূপজ মোহের প্রগাঢ়তা দেখানো হইয়াছে, **রুক্মিণীর** পত্রে তাহার কোন চিহ্ন নাই, সেখানে প্রেমের লালসাহীন এক উচ্চ আদর্শ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। রুক্মিণীর পত্রে ইন্দ্রিয়-বিকারের স্পর্শ নাই, রূপ যৌবনের প্রসঙ্গ নাই ; যে হৃদয়, প্রিয়তমকে না দেখিয়া, কেবল তাঁহার গুণকাহিনী শুনিয়াই, আত্মসমর্পণ করিতে পারে, তাহাতে ইন্দ্রিয়-বিকার থাকিতে পারে না। হৃদয়ে যে অনুরাগ জাগিলে ভক্ত, আরাধ্য দেবতাকে প্রিয়তমভাবে ভালবাসিবার জন্য ব্যাকুল হন, রুক্মিণীর প্রেমের মূলে সেই অনুরাগ বর্তমান। কিজন্য লজ্জাশীলা কুলবালা হইয়াও রুক্মিণীদেবী আপনার প্রিয়তমকে পত্র লিখিতে সাহসী হইয়াছিলেন, কবি তাহার অতি সুন্দর কারণ দেখাইয়াছেন। সন্ন্যাসিনী যেমন নির্জন বনপ্রদেশে ইষ্টদেবতার মূর্তি স্থাপন করিয়া গোপনে পূজা করেন, রুক্মিণীদেবীও তেমনি নিজের হৃদয়-মন্দিরে ইষ্টদেবরূপী প্রিয়তমের মূর্তি স্থাপন করিয়া ভক্তিভরে পূজা করিতেন। কেহ জানিত না, কেহ দেখিত না ; তাঁহার হৃদয় তাহাতেই পরিতৃপ্ত ছিল ; কিন্তু নির্জন পূজাতে ব্যাঘাত ঘটিল। কালরূপী শিশুপাল তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিল, তাই তিনি বিপদভঞ্জনকে লিখিলেন।

"তার, হে তারক তারে এ বিপত্তি কালে।"

রুক্মিণী-পত্রিকায় ভাগবত বর্ণিত যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, কবি তাহা এরূপ হৃদয়গ্রাহীভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, পাঠ করিলে মনে হয়, যেন কোন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব-কবির রচনা পাঠ করিতেছি। "তবে ভাগবতে কৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণীর যে পত্র আছে, যাহার প্রথম শ্লোক হইতেছে ঃ

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃন্বতাং তে
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥

তাহার তুলনায় কিন্তু 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী' কবিতাটি তেমন জমে নাই।"

বীরাঙ্গনা কাব্যের তারা সূর্পণখা প্রভৃতির প্রেম-পত্রিকা যেমন আবেগময়ী **জাহ্নবী**-দেবীর প্রত্যাখ্যান-পত্র তেমনই কঠোর। জাহ্নবী-দেবী যেখানে রাজা শান্তনুকে বলিয়াছিলেন ঃ

"পূর্ব্বকথা ভুলি,
করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ
প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা ! শৈলেন্দ্রনন্দিনী
রুদ্রেন্দ্রগৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে।"

তাহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, প্রেম-ভিক্ষা বর্ণনার ন্যায় প্রেম-প্রত্যাখ্যান-বর্ণনাতেও কবি সমান পারদর্শী। চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধে বীরাঙ্গনা-কাব্যের প্রেম-পত্রিকাগুলিই কবির মৌলিকতার ও নৈপুণ্যের অধিক পরিচয় দান করে। কিন্তু অন্য পত্রগুলিতেও নৈপুণ্যের অভাব নাই।

দ্রৌপদী, শকুন্তলা, ভানুমতী এবং **দুঃশলা**, চারিজনেই প্রোষিতভর্তৃকা। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইজন স্বামীর বিস্মরণে উৎকণ্ঠিতা, আর বাকী দুইজন্ স্বামীর অমঙ্গল ভয়ে শঙ্কিতা। প্রত্যেকেরই পত্রে কবি প্রত্যেকের অবস্থা অনুযায়ী ভাব সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

দ্রৌপদী-পত্রিকায় প্রথমেই দীর্ঘ বিস্মরণের দরুণ অর্জুনের স্বর্গে অবস্থানকালীন আচরণের প্রতি যে সকল ইঙ্গিত স্থান পাইয়াছে তাহাতে একই সঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে বিবাহিতা পত্নীর রহস্যপ্রিয়তা এবং অভিমানিনীর দুর্জয় অভিমান। এখানকার উক্তিগুলি একমাত্র সেই রমণীর পক্ষেই সম্ভব যিনি দাম্পত্যপ্রেমের সুখসায়রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকার মধুরাস্বাদ লাভ করিয়াছেন, এবং যিনি পতি-সোহাগিনী বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের ফলে বিরহ জ্বালা নিবারণের জন্য পতির প্রতি যে কোন উক্তি প্রয়োগ করিতে সাহসী। তাই দ্রৌপদী ও শকুন্তলা অনেকটা সমগোত্রীয়া হইলেও দ্রৌপদীর মুখের কথা শকুন্তলার মুখে মানায় না ; কেবল শকুন্তলা কেন, দ্রৌপদীর কথা এই বীরাঙ্গনা-কাব্যের আর কোন নায়িকার পক্ষে প্রযোজ্য নহে, উহা একান্তরূপে দ্রৌপদীর নিজস্ব। কারণ আর কেহ এমন করিয়া আপন স্বামীর হৃদয়েশ্বরী বলিয়া গর্ব অনুভব করিতে পারেন না। ইনি যে মুহূর্তে স্বামীকে—

—শত ফুল প্রফুল্ল যে বনে,
কি সুখে বঞ্চিত, সখে, শিলীমুখ তথা ?

ইত্যাদি বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছেন সেই মুহূর্তেই ইহা নিশ্চিত জানেন, এই ব্যঙ্গের খোঁচা তাঁহার স্বামীকে বিরক্ত বা বিরূপ না করিয়া বরং লজ্জিতই করিবে, এবং তাহার স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমন বরং আরও ত্বরিত করিয়া দিবে। পতি-প্রেম সম্পর্কে

নিজের উপর কতখানি নির্ভর থাকিলে তবে অমন অশেষশক্তিশালী পতিকে এইভাবে দক্ষিণে ও বামে নির্বিকারে ব্যঙ্গের খোঁচা দেওয়ার সাহস আসে, ইহাই ভাবিতে হয়। এই নির্ভরের পরিচয় আমরা পাই, স্বর্গের পারিজাত আনিবার আবদারে, পত্রবাহক ঋষিপুত্রকে যথাবিধি আপ্যায়ন করিবার উপদেশ, উত্তরের পরিবর্তে সশরীরে হাজির হইবার অনুরোধে।

পত্রিকাটির মধ্যে দ্রৌপদীর কুমারী অবস্থায় মানসলোক, স্বয়ম্বর সভায় তাহার আশা-নিরাশার হিল্লোল, অর্জুনের বিস্ময়কর আবির্ভাব, যুদ্ধকালে অর্জুনের উচ্চারিত প্রেম ও আশার অবিস্মরণীয় বাণী, দ্রৌপদীর বহুস্বামিত্ব সত্ত্বেও অর্জুনের প্রতি পক্ষপাত, প্রভৃতি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মোটের উপর এই পত্রিকাটির মধ্যে 'এমন কতকগুলি চিহ্ন রহিয়াছে যাহা হইতে বুঝা যায়, দ্রৌপদীর ন্যায় পরিণত নায়িকা ব্যতীত কোনও নবানুরাগিণী বালিকা কর্তৃক পত্রিকাখানি লেখা সম্ভব ছিল না।'

দ্রৌপদীর ন্যায় **শকুন্তলাও** প্রোষিতভর্তৃকা এবং বহু-পত্নীক স্বামীর পত্নী। কিন্তু শকুন্তলা সরলা ঋষি-বালিকা; ব্যঙ্গবাণে কাহারও মর্মভেদ করা তপোবন-পালিতার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। অথচ প্রেম সকলেরই সমান, তাহার জ্বালাও সকলকেই অস্থির করে। তবে দ্রৌপদী যেখানে ব্যঙ্গের আশ্রয় লইয়াছেন, সেখানে শকুন্তলা কেবল আপন ভাগ্যের উপর দোষারোপ করিয়া কখনও বা প্রেমের কুটিলগতির কথা স্মরণ করিয়া নিজের দুঃখভার নিজেই বহন করিতে চাহিয়াছে :

> হে বিধাতঃ, এই কি রে ছিল তোর মনে?
> এই কি রে ফলে ফল প্রেমতরু-শাখে?

কুটীরবাসিনী বালিকাকে পৃথিবীর রাজরাজেশ্বর যে চরণে স্থান দিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট; বালিকা তাহার হৃদয়েশ্বরী হইবার আশা করিবে কেন? যাহার পিতার উপদেশ :

> "কুরু প্রিয়-সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে,
> ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।"

স্বামী বহুপত্নীক হইলে তাঁহাকে যে ব্যঙ্গে লাঞ্ছিত করিতে হয়, শকুন্তলার পক্ষে সেরূপ ভাব ব্যক্ত করিবার সম্ভাবনা নাই। বন-নিবাসিনী বল্কলবসনা বালিকা রাজাধিরাজের সহধর্মিণী হইয়াছে; এ অবস্থায় তাহার মনে দুই একটি উচ্চাভিলাষ উদিত হওয়া অসঙ্গত নহে। মায়াবিনী স্বপ্নদেবী তাহাকে নিদ্রাযোগে তাহার প্রিয়তমের ঐশ্বর্য প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু বালিকার তাহাতে লালসা ছিল না। ফলমূল আহারে তৃপ্তা এবং কুশাসন-শয়নে অভ্যস্তা বালিকা রাজভোগ লইয়া কি

করিবে? সপত্নীগণের প্রতি স্বামীর অনুরাগ? তাহাতেও বালিকার উদ্বেগ ছিল না। স্বামীর পায়ের তলায় দাসীর ন্যায় অবস্থান করিবে, ইহাই বালিকার একমাত্র আশা। শকুন্তলা তাই লিখিয়াছিল :

"আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে
রোহিণী ; কুমুদী তাঁরে পূজে মর্ত্ত্যতলে !
কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে !"

শকুন্তলার পত্র করুণ বিলাপে পূর্ণ। কাননের কুসুম কাননে ফুটিয়াছিল, রাজা দুষ্মন্ত কি পদদলিত করিবার জন্যই তাহাকে বৃন্তচ্যুত করিলেন? শকুন্তলা-পত্রে অন্তরের এই প্রশ্নই ভাষা পাইয়াছে অশ্রুজলে।

শকুন্তলা-পত্রিকার অপর একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা আর কোন পত্রিকায় আশা করা যায় না। শকুন্তলায় প্রেমের তিনটি স্তরের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। দুষ্মন্তের সুদুর্লভ সাহচর্যে যে প্রেম একবার আস্বাদিত হইয়াছে, তাহার পবিত্র স্মৃতি শকুন্তলাকে করিয়াছে আবেশ-বিহ্বল। গান্ধর্বমতে বিবাহ যখন হইয়াছে, তখন সে তো প্রেমের সতীত্বের দাবী রাখে ; তাই সতী-প্রেমের উন্মাদনায় সে ছুটিয়া যায় কখনও নিকুঞ্জ-বনে, কখনও রসাল-তলে কখনও বা লতামণ্ডপে। কিন্তু এই অতীত প্রেম আজ ভাগ্যবলে স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। বর্তমানে শকুন্তলার প্রেম দ্বন্দ্ব-সংশয়ে বিজরিত। কুটীরবাসিনী হইবে রাজরাজেশ্বরী এত বড় সৌভাগ্য কি তাহার সহিবে? যদি তাহার প্রাণবল্লভের এই বিস্মৃতি না কাটিয়া যায়? যে চির-অভাগিনী তাহার যদি সেই অভাগ্যের বোঝা চিরকালই বহিতে হয়? সমস্ত সুখস্মৃতির মধ্যে সংশয়ের এইরূপ অজস্র খোঁচায় শকুন্তলার বর্তমান প্রেম বিড়ম্বিত। আবার ইহার মধ্যেই আছে ভবিষ্যৎ-প্রেম-প্রতিষ্ঠার এক স্বপ্নময় চিত্র। নিদ্রাদেবী যখন বাহিরের চেতনা হরণ করেন, তখনই শকুন্তলার অবচেতনে জাগিয়া উঠে অতুল সুখস্বাচ্ছন্দ্যময়ী রাজপুরী। সে তো রাজৈশ্বর্য চাহে না, চাহে কেবল প্রাণবল্লভের চরণ-সেবার অধিকার, সেই অধিকারে সে হয়ত বঞ্চিত নাও হইতে পারে। এইভাবে জাগে এক ক্ষীণ আশার আলোক যদিও তাহা বর্তমানের সংশয়-মেঘে নিষ্ঠুরভাবে আচ্ছন্ন। প্রেমের এই ত্রিধারার এক অপূর্ব সঙ্গম শকুন্তলা-পত্রিকার একান্ত নিজস্ব সম্পদ।

প্রোষিতভর্তৃকা দ্রৌপদী ও শকুন্তলা যেমন স্বামীর বিস্মরণে উৎকণ্ঠিতা ও অভিমানিনী, দুর্যোধন-পত্নী **ভানুমতী** এবং জয়দ্রথ-পত্নী **দুঃশলা** তেমনি স্বামীর অমঙ্গলভয়ে ভীতা। ভানুমতীর পত্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এবং

দুঃশলার পত্র অভিমন্যুবধের অব্যবহিত কাল পরে লিখিত। স্বামীর অমঙ্গল-আশঙ্কা উভয়কেই, যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিবার জন্য, স্বামীকে পরামর্শদানে বাধ্য করিয়াছিল। ভানুমতীর পত্রে কবি কৌরবরাজ-অন্তঃপুরের অতি সুস্পষ্ট চিত্র প্রদান করিয়াছেন। দুঃশলার পত্র মধুসূদনের স্বভাবসিদ্ধ বীররস-বর্ণনাশক্তির উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। পুত্রশোককাতর অর্জুনের জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞা যেখানে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কবির বর্ণনাগুণে পাঠক সেই অতীত ঘটনা যেন প্রত্যক্ষের ন্যায় দেখিতে পান। ভানুমতী কৌরবকুলের বধূ, স্বামীর কল্যাণের ন্যায় কৌরবকুলের মঙ্গলও তাঁহার চিন্তার বিষয়। তিনি তাই দুর্যোধনকে লিখিয়াছেন :

"কি অভাব তব, কহ ? তোষ পঞ্চজনে ;
তোষ অন্ধ বাপ, মায়ে ; তোষ অভাগীরে ;—
রক্ষ কুরুকুল, ওহে কুরুকুলমণি !"

কিন্তু দুঃশলা কৌরবকুলের দুহিতা, স্বামীর কল্যাণের জন্যই তিনি অধিক উৎকণ্ঠিতা, পিতৃকুলের জন্য তাঁহার সেরূপ চিন্তা নাই। তিনি লিখিয়াছেন :

"অবিলম্বে যাব
এ পাপ নগর ত্যজি সিন্ধুরাজালয়ে !
... ...
ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে কুরু-পাণ্ডু-কুলে ?"

ভানুমতী দুর্যোধনের পত্নী ; সাধ্বীর পত্রে স্বামীর নিন্দা থাকা সঙ্গত নহে। ভানুমতী সমস্ত দোষ শকুনির এবং কর্ণের উপর চাপাইয়াছেন ; কিন্তু দুঃশলা দুর্যোধনের ভগ্নী, তিনি দুষ্টমতি ভ্রাতার ব্যবহারের উল্লেখে নিরস্ত হন নাই। অবস্থা বিবেচনায়, উভয়ের মনের ভাব যেরূপ হওয়া সঙ্গত ও স্বাভাবিক, দুইজনের লিপিতে তাহাই সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

বীরাঙ্গনার অনুযোগ-পত্রিকাগুলি অনেকের মতে কাব্যের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। নীলধ্বজের প্রতি **জনার** এবং দশরথের প্রতি **কৈকেয়ীর** পত্রিকা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। হৃদয়ভেদী আর্তনাদ, মর্মান্তিক ব্যঙ্গ, এবং কঠোর তিরস্কার সম্মিলিত হওয়াতে তীব্রতা ও উত্তাপে এই লিপি দুইখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। জনা-চরিত্র মূল মহাভারতে নাই, কাশীরাম দাস হইতে মধুসূদন উহা গ্রহণ করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের চিত্রাঙ্গদায় কবি পূর্বে পুত্রশোকাতুরা মাতার যে ছবি আঁকিয়াছেন, বীরাঙ্গনার জনায় তাহাই রঙে ও রেখায় সম্পূর্ণতা পাইয়াছে। কৈকেয়ী এবং জনা উভয়েই স্বামীর ব্যবহারে মর্মপীড়িতা ; কিন্তু উভয়ের অবস্থার বিশেষ

পার্থক্য আছে। সপত্নী ও সপত্নীপুত্রের সৌভাগ্যই, কৈকেয়ীর যন্ত্রণার কারণ; কিন্তু জনার দুঃখ ইহার অপেক্ষা সহস্রগুণ মর্মভেদী। সেইজন্য তাঁহার পত্র গৈরিক ধাতু-নিস্রাবের ন্যায় জলন্ত উচ্ছাসে পূর্ণ। একদিকে কাপুরুষ স্বামীকে তিরস্কার, অন্যদিকে আততায়ী পাণ্ডবদিগকে মর্মান্তিক ব্যঙ্গ, এবং সেই সঙ্গে বীরপুত্রের জন্য হৃদয়ভেদী বিলাপ সম্মিলিত হওয়াতে জনা পত্রিকা আত্যন্ত মর্মস্পর্শী হইয়াছে। বীরাঙ্গনা কাব্যে জনাই একমাত্র বীরাঙ্গনা রূপে চিত্রিত হইয়াছে।

বীরাঙ্গনা কাব্যের দোষ-ত্রুটির কথা এইবার আলোচনা করা যাইতে পারে। ওবিদকে আদর্শ করিয়া মধুসূদন একটি নিন্দনীয় ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। ওবিদের অনেকগুলি পত্র অতি কলুষিত প্রেমের চিত্র অবলম্বনে কল্পিত। ওবিদ একদিকে যেমন সাধ্বীকুল-গৌরব পেনিলোপের এবং পতিপ্রাণা লাওডোমিয়ার পবিত্র প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন, অন্যদিকে আবার তেমনই সহোদরের প্রতি অনুরাগিণী কলুষচিত্তা ক্যানেসের এবং সপত্নী-পুত্রের প্রেমে মুগ্ধা ফিড্রার সম্পর্ক-বিরুদ্ধ আসক্তি বর্ণনায় স্বীয় লেখনী কলঙ্কিত করিয়াছেন। এই অপবিত্র আদর্শ হইতেই মধুসূদন উর্বশী, সূর্পণখা এবং তারা—এই তিনজনের প্রেম পত্রিকা রচনায় প্রণোদিত হইয়াছিলেন। তিনি ইহাদিগের প্রত্যেকের চরিত্র যেরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহারই উপযুক্ত উপাদান দিয়া, নৈপুণ্যের সহিত তাহা চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন। কবি ইহার জন্য প্রশংসার দাবী করিতে পারেন। কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি যে কদর্য রুচির পরিচয় দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার নিন্দা না করিয়া থাকা যায় না। উর্বশীর ও সূর্পণখার প্রেমপত্র সম্বন্ধে তাঁহার সমর্থন থাকিতে পারে, কিন্তু তারা-পত্রিকা সম্বন্ধে তাঁহার কোনো সমর্থন নাই। গুরুপত্নী-গমন আমাদের শাস্ত্রে মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত। সেই মহাপাতক-মূলক ঘটনাকে তিনি কেমন করিয়া রুক্মিণীর ও শকুন্তলার জীবনের সঙ্গে গ্রথিত করিলেন, তাহা বলিতে পারি না। বিশেষত, তারা-চরিত্র তিনি যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে মূল-পুরাণ-বিরোধী। বীরাঙ্গনা-কাব্যের তারার কাম-কলুষিত প্রেমভিক্ষার সঙ্গে পাঠক ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের তারার রোষপ্রদীপ্ত ভৎর্সনা বাক্যগুলির তুলনা করিলে মধুসূদন তারা-চরিত্র সম্বন্ধে কিরূপ ভ্রমে পড়িয়াছেন, বুঝিতে পারিবেন। পৌরাণিক তারা সম্পূর্ণ নিরাপরাধা। অসদৃশ ব্যবহারে উদ্যত চন্দ্রকে তিনি বলিয়াছেন:

> "ত্যজমাং ত্যজমাং চন্দ্র, সুরেষু কুলপাংশুক।
> গুরুপত্নীং ব্রাহ্মণীঞ্চ, পতিব্রত-পরায়ণাং।
> গুরুপত্নীসঙ্গমান ব্রহ্মহত্যাশতং লভেৎ।
> পুত্রস্তং মাতাহং, ধৈর্য্যং কুরু সুরেশ্বর।"

এইরূপ তিরস্কারের পরও চন্দ্রকে নিরস্ত না দেখিয়া তিনি তাঁহাকে এই ভয়ঙ্কর অভিশাপ দিয়াছিলেন :

"শশাপ তারা কোপেন নিষ্কামা সা পতিব্রতা
রাহুগ্রস্তো, ঘনগ্রস্তঃ, পাপযুক্তোভবান ভব ॥
কলঙ্কী যক্ষ্মাণাগ্রস্তো ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥"

এই তারার সঙ্গে মধুসূদনের "কর আসি—কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে, তারানাথ—" এরূপ প্রলাপভাষিণী তারার কি প্রভেদ!

শেষ কথা, কাহিনী সম্পর্কে দুই একটি পত্রিকায় কবির স্বেচ্ছাচার মানিয়া লইলে 'বীরাঙ্গনা'কে বাংলা কাব্যজগতে এত অনবদ্য সৃষ্টি বলিতে হয়। যুগ-প্রবর্তক মধুসূদনের যে লোকোত্তর প্রতিভা বাংলার সাহিত্যাকাশে চির ভাস্বর হইয়া আছে, তাহারই উজ্জ্বলতম শিখাটি এই 'বীরাঙ্গনা'তেই প্রজ্বলিত। মধুসূদনের বহুমুখী প্রতিভাকে যদি কোন একটি স্থানে আমরা দেখাইতে চাই তবে এই 'বীরাঙ্গনা'কেই আমাদের শ্রদ্ধার সহিত তুলিয়া লইতে হইবে। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে ও কল্পনায় ইহাই মধুকবির মানসলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়।

৪। পত্রিকা-বিশ্লেষণ

শকুন্তলা-পত্রিকা

মহামুনি কণ্বের পালিতা-কন্যা শকুন্তলা কণ্বের তপোবনেই পালিতা হইয়াছিল। তার যৌবনকালে একদিন আশ্রমে রাজা দুষ্মন্তের আবির্ভাব হয় এবং তপোবনেই তাহাকে বিবাহ করিয়া, রাজা দুষ্মন্ত চলিয়া যান। যাইবার সময় মহারাজ সরল-প্রাণা শকুন্তলাকে কত আশ্বাস দিয়া গিয়াছিলেন এবং শীঘ্রই তাহাকে সমাদরে ও সমারোহে রাজধানীতে লইয়া গিয়া রাজ-অন্তঃপুরে স্থান দিবেন এমন প্রতিশ্রুতিও দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু দুষ্মন্ত আর আসিলেন না। শুধু আসিলেন না, তাহা নহে—শকুন্তলাকে তিনি একেবারে বিস্মৃত হইলেন। কোনও সমাচার পর্যন্ত লইলেন না। একে স্বামীর এই অপ্রত্যাশিত বিস্মরণ, তাহার উপর তাহার গর্ভে সন্তানের আবির্ভাব, এই অবস্থায় শকুন্তলার মনের ভাব সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। দুর্বাসার শাপে এমন যে ঘটিবে তাহা অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা জানিত, কিন্তু তাহারা মুখ ফুটিয়া তাহাদের প্রিয়সখীকে এই নিদারুণ কথা বলে নাই। কাজেই শকুন্তলা প্রতিক্ষণই দুষ্মন্ত কিংবা দুষ্মন্তের লোকজনের

প্রতীক্ষা করিত। বাতাসের আওয়াজ হইলে কিংবা বাতাসে ধূলারাশি উড়িলে সরলা আশ্রমবালিকার মনে অমনি আশার সঞ্চার হয়, সে ভাবে ঐ বুঝি রাজার লোকজন তাহাকে লইতে আসিয়াছে :

"হাদে দেখ্, সই, এতদিনে আজি
স্মরিলা লো প্রাণেশ্বর এ তাঁর দাসীরে!
ওই দেখ্, ধূলারাশি উঠিছে গগনে!
ওই শোন্ কোলাহল! পুরবাসী যত
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে!"

কিন্তু এ শুধু শকুন্তলার আশা-ই। এ আশা তাহার মনে জাগে, কেবল তাহাকে কাঁদাইবার জন্য। সে ছুটিয়া যায় নিকুঞ্জবনে; সেখানে তেমনি আছে, মুকুলিত লতা, কোকিলের গীত, কপোত-কূজন, অলি-গুঞ্জন, কিন্তু যে পদযুগ দেখিবার জন্য সে ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করে চতুর্দিকে, তাহা তো দেখিতে পায় না। আর অমনি দুই চোখ তাহার জলে ভাসিয়া যায়। তবে কি এত আদর, এত আশ্বাস, সবই মিথ্যা? চোখের উপর সে দেখে, যে সমীরণ সরস বৃক্ষ-পত্রকে আদর করিয়া নাচায়, শুষ্ক হইলে, সেই সমীরণই ঘৃণায় পত্ররাজি বিতাড়িত করে। বর্তমান স্বামিবিরহে এই প্রাকৃতিক দৃশ্য শকুন্তলার মনে এই আশঙ্কা জাগায়, 'তেমতি দাসীরে কি রে ত্যজিলা নৃপতি?'

তপোবনের প্রতিটি পদার্থ আজ শকুন্তলার নিকট দুষ্মন্ত-স্মৃতি-বিজড়িত। তাহার মনে পড়ে, ভ্রমর আসিয়া তাহার অধর আক্রমণ করিলে সেই পুরু-কুল-নিধি সহসা আবির্ভূত হইয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু আজ তো আর কেহই তাহাকে পরিত্রাণ করিতে আসিবে না! শকুন্তলার বিড়ম্বনার শেষ নাই। এই যে বিরহের জ্বালা, ইহা তাহার মরম-সখী অনসূয়া-প্রিয়ংবদার নিকটেও চাপিয়া রখিতে হইবে, নচেৎ তাহারা রাজাকে যেভাবে নিন্দা করে তাহা পতিগতপ্রাণার প্রাণে সহ্য হয় না। গৌতমী তপস্যায় রত আছেন, ইহাই ভাগ্যের জোর, নচেৎ এতদিনে এই গোপন-প্রণয়িণীর সর্বনাশ হইত।

এইরূপ নানা সংঘাতের মধ্যে পড়িয়া শকুন্তলা মাঝে মাঝে সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলে। চৈতন্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চোখে ভাসিয়া উঠে দুষ্মন্তের মূর্তি; দুই হাত বাড়াইয়া এই মুগ্ধা তরুণী ছুটিয়া যায় পদযুগল বেষ্টন করিবার জন্য,—কিন্তু কেবল ক্রন্দনই হয় তারার পরিণাম। দিশাহারা হইয়া সে কাঁদিয়া বলে :

'কি পাপে সহি হেন বিড়ম্বনা!
কি পাপে পীড়েন বিধি, সুধিব তা কারে?'

নিদ্রার আবেশে শকুন্তলা যে স্বপ্ন দেখে, তাহাতে কতই না সৌন্দর্য-ঐশ্বর্যের লীলা; অবশ্যই সেগুলি তাহার অবচেতনে এক সোনার ভবিষ্যৎ আঁকিয়া যায়। কিন্তু 'নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে কি সুখ তার, জাগে সে কাঁদিতে।'

আবার আমরা দেখিতে পাই যে, ঋষিতনয়া শকুন্তলার মনে ঐশ্বর্যের কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই; কেবলমাত্র স্বামিসেবা করিতে পারিলে সে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে:

"কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব! সেবিবে
দাসীভাবে পা দুখানি—এই লোভ মনে,—
এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে!
... ...
...কি কাজ, প্রভু, রাজসুখ-ভোগে?
... ...
কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে!"

পত্রশেষে শকুন্তলা লিখিতেছে যে, যাহার হাত দিয়া সে এই লিপি প্রেরণ করিবে সে নিতান্তই বনবাসী; তাহার পক্ষে রাজপুরে প্রবেশ করা সম্ভবপর কিনা এবং প্রবেশ যদি বা করিতে পারে তবে রাজার হস্তে পত্রখানি সে দিতে পারিবে কিনা—এ-বিষয়ে শকুন্তলার মনে সন্দেহ থাকিলেও সে আশা ছাড়িতে পারে না:

"কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি ধরে
তৃণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে!
জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে!"

আশাহতা নারীর এই যে দুরাশা ইহার মধ্যে এক মর্মান্তিক দীর্ঘশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

এইভাবে সমগ্র লিপিখানিতে চিরন্তন কাব্যসুন্দরী শকুন্তলার বিরহিণী রূপ, নারী-হৃদয়ের উৎকণ্ঠা, স্বামীর প্রতি অভিমান ও অনুযোগ—অপূর্ব কবিত্ব-সুষমায় মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কাব্যের শকুন্তলা যেমন অপূর্ব সৃষ্টি, এই পত্রিকাখানিও তেমনি বিরহখিন্না আশ্রম-বালিকার এক সুন্দর আলেখ্য।

তারা-পত্রিকা

প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তারার পত্রের প্রধান সুরটি হইল—প্রণয়ভিক্ষা। রোমান্টিক প্রেমের যে আদর্শ বীরাঙ্গনা কাব্যের ভিতর দিয়া মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন, সেই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই এই পত্রিকাখানি বিচার করা সঙ্গত, নতুবা ইহা সুরুচিসঙ্গত নয় বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক।

পুরাণের তারা আর বীরাঙ্গনা কাব্যের নায়িকা তারা এক নহে। মধুসূদনের সৃজনীপ্রতিভা তারা-চরিত্রের ভিতর দিয়া রোমান্টিক প্রেমের যে ছবি আঁকিয়াছে, তাহা এই বিংশ শতকের আধুনিকতার মধ্যাহ্নেও ম্লান হইয়া যায় নাই।

দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রমে বাস করিয়া সোমদেব অর্থাৎ চন্দ্র বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন। বৃহস্পতির পত্নী তারার পক্ষে চন্দ্রের অসামান্য সৌন্দর্য সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হওয়া সঙ্গত কি না, ইহা বিচার্য নহে ; বিচার্য হইল, যে পরিস্থিতিতে তারার হৃদয়ে সোমের প্রতি আকর্ষণ জাগিয়াছিল, তাহাতে নারী-হৃদয়ের এই আন্দোলন স্বাভাবিক ও মনস্তত্ত্ব-সম্মত হইতে পারে। কবি যদি তারার এই পরিবর্তনের উপযোগী যথেষ্ট শক্তিশালী পরিস্থিতি অঙ্কন করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সেইখানেই তাঁহার সৃষ্টির স্বার্থকতা। স্বামী শিষ্যসঙ্গে শাস্ত্রচর্চা লইয়া দিনপাত করেন ; আশ্রমে যে এক নারী আছে এবং সেই নারীর হৃদয়ে যে কামনা-বাসনা থাকিতে পারে—দেবগুরু বোধ হয় তাহা ভুলিয়া গিয়া থাকিবেন। কিন্তু নবজাগ্রত যৌবন যে বল্কলের শাসন মানিতে পারে না, ইহা একটিবারও ঋষির কল্পনায় জাগে নাই। আশ্রমে সুন্দরী স্ত্রী, সুদর্শন ছাত্র—ইহার পরিণতি যা হওয়া স্বাভাবিক, মধুসূদন এই পত্রিকায় তাহাই দেখাইয়াছেন। পুরাণের কাহিনীকে তিনি অনুসরণ তো করেনই নাই, বরং ইহার নির্মাণে বহুল পরিমাণে স্বাধীনতা লইয়াছেন। তাঁহার মত শক্তিধর কবির পক্ষেই এইরকম স্বাধীনতা লওয়া সম্ভব—অন্যে ইহা কল্পনাও করিতে পারিত না। তারার এই রোমান্টিক প্রেমের আদর্শ সৃষ্টি করিয়া মধুসূদন কাব্যে একটি নূতন পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।

তারা যে মনে মনে চন্দ্রের প্রতি অনুরক্তা সম্ভবতঃ চন্দ্র তাহা জানিতেন না। চন্দ্রের রূপ ও সৌন্দর্যে মুগ্ধা হইয়া তারা চন্দ্রের নিকট একখানি প্রণয়লিপি পাঠাইলেন তখন, যখন অধ্যয়ন শেষে শিষ্য গুরুদক্ষিণা প্রদানান্তে গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। এমন নাটকীয় পারস্থিতিতে পত্রের ভাব ও ভাষা যেরকম হওয়া উচিত, তারা-পত্রিকাখানি ঠিক সেইভাবেই বিরচিত হইয়াছে। নারী-হৃদয়ের এমন সকরুণ বিলাপ ; প্রণয়াস্বাদের এমন মর্মান্তিক আকূতি যে, তাহা পাঠকের কল্পনা ও অনুভূতিকে সহজেই উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। যেন একটি বুভুক্ষিত নারী-হৃদয় কথা বলিতেছে :

> "কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি,
> তোমার অভাগী তারা ? গুরুপত্নী আমি
> তোমার, পুরুষরত্ন ; কিন্তু ভাগ্যদোষে,
> ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি !"

সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার মধ্যে রূপজমোহ প্রকটিত হইয়াছে—রোমাণ্টিক প্রেমের ভিত্তি প্রধানতঃ এই রূপজমোহ; কবি ইহা বিশেষভাবে জানিতেন বলিয়াই তিনি এই পত্রে তাহাই স্বাভাবিক ভঙ্গীতে প্রকাশপূর্বক কাব্যের সৌন্দর্য অম্লান রাখিয়াছেন।

সোমকে স্বামীর আশ্রমে প্রথম দিন দেখিবার পর (এবং এই দর্শন যে অন্তরাল হইতে ঘটিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়), তারার নারী-হৃদয় আনন্দে যেভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তিনি এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :

"যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশিকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে !"

এখানে 'নবকুমুদিনী' উপমাটি প্রয়োগ করিয়া কবি স্বল্পকথায় অনেক কিছু প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পর, 'শান্ত আশ্রম' এই ব্যঞ্জনাটি তারার নারী-হৃদয়ের প্রেমের পূর্ববর্তী শান্ত ও প্রেমের উত্তাপশূন্য অবস্থার ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে। সোমকে দর্শন করিবার পর নারীর অন্তরে প্রথম প্রতিক্রিয়া যাহা হওয়া স্বাভাবিক, কবি তারার মুখ দিয়া নিঃসঙ্কোচে তাহা বলাইয়াছেন। আশ্রমের বেশভূষা—যাহা সামান্য বল্কল মাত্র—তারার আর মনে ধরে না। দর্পণে মুখ দেখিয়া যত্নে তিনি কবরী রচনা করিলেন; ফুল তুলিয়া তাহাকেই রত্নজ্ঞানে কুন্তলে ধারণ করিলেন; বল্কল বসনে আর রুচি রহিল না! তখন বনদেবীর নিকটে কাঁদিয়া

"দুকুল কাঁচলী, সিঁতি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী
কুণ্ডল, মুকুতাহার, কাঞ্চী কটিদেশে"

চাহিয়া লইলেন প্রেমিকের সাজে সজ্জিত হইবার উদ্দেশ্যে।

পত্রিকার আর একস্থানে তারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে শুধু যে প্রণয়িণীর হৃদয়-বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে—উহার ভিতর দিয়া নব অনুরাগে অনুরাগিণী নারীর অন্তরের নিগূঢ় কামনাও প্রকাশ পাইয়াছে :

"গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে,
সুধানিধি, মুদি আঁখি, ভাবিতাম মনে
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি,
মান-ভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরণে !"

পরকীয়া প্রেমের যাহা কিছু বৈচিত্র্য, কবি তাহার সবটুকুই নিপুণভাবে স্তরে স্তরে

উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। এমন কি, তারা যে সধবা, তাঁহার স্বামী বর্তমান এবং এমন অবস্থায় স্বীয় পতির শিষ্যের প্রতি অনুরক্তা হইয়া উন্মার্গগামিনী হওয়া যে অবৈধ, সে-বিষয়েও তারার নারী-হৃদয় সম্পূর্ণ সচেতন এবং সচেতন বলিয়াই অসংযত প্রবৃত্তির অধীনা হইয়াও তিনি নিজের এই নৈতিক স্খলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন এবং অনুতাপ করিয়াছেন ঃ

"হায় ধিক, কি পাপে,
হায় রে, কি পাপে, বিধি এ তাপ লিখিলি
এ ভালে ? জনম মম মহা ঋষিকুলে,
তবু চণ্ডালিনী আমি ?"

এই অনুতাপেই তারার পরকীয়া প্রেম সার্থক হইয়াছে এবং কবির চিত্রও পূর্ণতালাভ করিয়াছে। কারণ ধর্মাধর্মের যে অনুশাসন পরকীয়াকে তাহা জয় করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কারের বশবর্তী মানুষের চিত্তে পাপ-পুণ্যের যে দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক ভাবে দেখা দেয় তাহাকে চাপিয়া রাখিলে শিল্পীর কৃতিত্ব খর্ব হয়। তাই মধুসূদন তারা-পত্রিকায় এই অনুতাপের ছবি আঁকিয়াছেন। কিন্তু এই অনুতাপকে সাময়িক হইতেই হইবে। বিরুদ্ধ সম্পর্কের অর্গল ভাঙিয়া যে প্রেম প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ লইয়া তারা-হৃদয়ের অন্তঃপুর হইতে একবার বাহিরে আসিয়াছে, তাহার আর ফিরিবার উপায় নাই।

"—প্রেম-উদাসিনী
আমি ! যথা যাও যাব ; করিব যা কর ;—
বিকাইব কায়মনঃ তব রাঙা পায়ে !"

এইভাবে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আত্মবিক্রয় করাই তাহার পক্ষে একটিমাত্র পন্থা। অসামাজিক প্রেমের এই দুর্দান্ত গতি, কবি অসম সাহসের সহিত নিঃশেষে চিত্রিত করিয়াছেন ; কারণ ইহা যে মানব-হৃদয়ের এক অতি কঠোর সত্য ; সত্যকে রূপায়িত করিতে ভয় কিসের ? তারার আজ আর তারানাথ বিনা গতি নাই, তাই পত্রশেষে তিনি যখন লিখেন ঃ

"কি আর কহিব,
জীবন-মরণ মম আজি তব হাতে।"

তখন এই প্রেম-বুভুক্ষু তরুণীর এক অতি বিষাদ-করুণ মূর্তি আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে।

রুক্মিণী-পত্রিকা

এই পত্রিকাখানিতে রুক্মিণীদেবীর অপার্থিব কৃষ্ণপ্রেম অতি সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এখানে রূপলালসা আছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়-বিকার নাই, আবেগ-ব্যাকুল

যৌবনের প্রসঙ্গ নাই, অথচ প্রেমের তীব্রতা আছে। শৈশব হইতেই রুক্মিণী বহুলোকের মুখে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া, মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছে; কুমারী হৃদয়ের অনুরাগের রঙে রাঙা বিশুদ্ধ প্রেমের অঞ্জলি দ্বারকানাথের উদ্দেশ্যে অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু যৌবন-সমাগমে তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ রুক্ম চেদীশ্বর শিশুপালের সহিত তাঁহার পরিণয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই অবস্থায় কবি কৃষ্ণগতপ্রাণা কুমারী রুক্মিণীর মনোভাবকে উপাদান হিসাবে গ্রহণ করিয়া, এই পত্রকাব্যে পূর্বরাগের অপূর্ব চিত্র আঁকিয়াছেন। সরমে কুণ্ঠিতা রুক্মিণী বলিতেছেন :

"কেমনে মনের কথা কহিব চরণে,
অবলা কুলের বালা আমি, যদুমণি ?
কি সাহসে বাঁধি বুক, দিব জলাঞ্জলি
লজ্জাভয়ে ? মুদে আঁখি, হে দেব শরমে !"

সংযত ভাষায় সলজ্জ প্রেমের এই কুণ্ঠিত অভিব্যক্তি অপূর্ব কবিত্বে মণ্ডিত হইয়াছে।

পত্রচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের জীবন-কাহিনী বর্ণনা করিবার ভঙ্গীটিও লক্ষ্য করিবার বিষয়। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-ই যে তাঁহাকে দ্বারকাপতির প্রতি অনুরাগিণী করিয়া তুলিয়াছে তাহাই বুঝাইবার জন্য কবি সংক্ষেপে কৃষ্ণলীলার অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের ভুবন-ভুলানো সৌন্দর্য কুমারীর হৃদয়ে এমনভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে যে—রুক্মিণী তাঁহার প্রেমাস্পদকে যেন সর্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছেন :

চিত্রপটে যেন
চিত্রিত যে মূর্ত্তি চির, হায়, এ হৃদয়ে !
নবীন-নীরদ-বর্ণ ; শিখি-পুচ্ছ শিরে ;
ত্রিভঙ্গ ; সুগল-দেশে বরগুঞ্জমালা ;
মধুর অধরে বাঁশী ; বাস পীত ধড়া ;
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন রাজিব-চরণে—

প্রেমাস্পদের জন্য অনুভূতি কত তীব্র এবং কল্পনা কত গভীর হইলেপর এমন নিখুঁত বর্ণনা সম্ভব তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। রুক্মিণীর প্রেমের সহিত ভক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণকে তিনি যে গোপনে হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন তাহাও তাঁহাকে পত্রে লিখিয়া জানাইতেছেন :

"হৃদয় মন্দিরে
স্থাপি সে সুশ্যাম মূর্ত্তি, সন্ন্যাসিনী যথা
পূজে নিত্য ইষ্টদেবে গহন বিপিনে,
পূজিতাম আমি নাথে।"

শ্রীকৃষ্ণের জন্য রুক্মিণীর প্রেম এমনই গভীর, ভক্তি এমনই অনন্যা যে, তাঁহাদের দেশে যে নদী আছে সেটিকে তিনি যমুনা বলিয়া আদর করিতেন এবং তাহার তীরে তমাল, কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষ রোপণ করিতেন। কুঞ্জবনে শুক-শারী, ময়ূর-ময়ূরী পুষিয়াছেন—এইভাবে একটি কৃত্রিম বৃন্দাবন-কুঞ্জ রচনা করিয়া রুক্মিণী তাঁহার আত্মরতি চরিতার্থ করিতেন। তাহার পর রুক্মিণী পত্রে এই কথাও জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহার ভাই চেদীশ্বর শিশুপালের সহিত তাঁহার বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভয় এবং ভাবনা "কেমনে অধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে রুক্মিণী?" তাই রুক্মিণীর শেষ কথা:

"লইনু শরণ আজি ও রাজীব পদে
বিঘ্নবিনাশন তুমি, ত্রাণ বিঘ্নে মোরে।"

সত্যই, আবাল্যসঞ্চিত কৃষ্ণ-প্রেমের এমন চিত্র বাংলা-সাহিত্যে নূতন। ভাগবতের রুক্মিণী তাই মধুসূদনের কাব্যে নানাবর্ণে সমুজ্জল—প্রেমভক্তির অনিন্দ্য-সুন্দর চিত্র। এক শ্রেণীর সমালোচকের মতে ভাগবতে কৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণীর যে পত্র আছে, তাহার তুলনায় মধুসূদনের রুক্মিণী-পত্রিকা তেমন জমে নাই। আমরা এই মন্তব্যকে অশ্রদ্ধা করি না, তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে, মধুসূদনের রুক্মিণী বৈশিষ্ট্যবর্জিত ভাগবত-কাহিনীর এক পুনরাবৃত্তি নহে। এখানে আমরা যে রুক্মিণীকে পাই, তিনি একই সঙ্গে নবানুরাগিণী কিশোরী এবং প্রেম-প্রৌঢ়া পরিণতা নারী। পত্রিকার প্রথমভাগে মনের কথা জানাইতে লজ্জায় তাঁহার 'কাঁপে হিয়া থর থরে!' তিনি স্পষ্ট কয়িয়া প্রণয়াস্পদের নামটিও বলিতে পারেন না। 'কে যে তিনি? জন্ম তাঁর কোন্ মহাকুলে?' ইত্যাদি কৌশলে অতি সন্তর্পণে ব্যক্ত করিতে চাহিতেছেন আপন মনের অভিলাষ। এইখানে আমরা পাই পূর্বরাগের বশবর্তিনী রুক্মিণীকে নবীনা কিশোরীরূপে। কিন্তু পত্রিকার দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিশেষতঃ ইহার শেষভাগে যখন আসি তখন দেখি সেই নবানুরাগিণী কখন যে 'শাশ্বত-রসিক-চিত্ত-বলভীর প্রৌঢ়-পারাবতী' রূপে পরিণত হইয়াছেন তাহা আমরা জানিতেও পারি নাই। বিবাহ না হইয়াও রুক্মিণী যেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত জন্মে জন্মে বিবাহিতা। তাহা না হইলে কি আর এমন নির্ভরমূলক কথা লিখিতে পারেন:

'স্বেচ্ছায় দিয়াছে দাসী, হায়, একজনে
কায়-মনঃ।'

'অন্য জনে'র কথা মুখে আনিতেও তাঁহার বাঁধে। তাই সোজাসুজি বলিলেন,—এ তো বলা নহে, এ যেন প্রেমের অধিকারমূলক নির্দেশ—'হর অভাগীরে তুমি

প্রবেশি এ দেশে!' তিনি যে কৃষ্ণার্পিত-মনপ্রাণ; সুতরাং একেবারেই কৃষ্ণের নিজস্ব সম্পদ। কালরূপে শিশুপাল তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, সুতরাং কৃষ্ণকে যেন, দয়া করিয়া নহে কর্তব্যবোধে রুক্মিণী-হরণ করিতেই হইবে—ইহাই রুক্মিণী-পত্রিকার শেষ কথা।

কৈকেয়ী-পত্রিকা

এই লিপিখানি বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রথম অনুযোগ-পত্রিকা এবং অন্যতম উৎকৃষ্ট পত্রিকা। রামায়ণে কথিত আছে, রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং অযোধ্যায় রাজ্যাভিষেকের বিপুল আয়োজন চলিতে থাকে। সমস্ত রাজপুরী উৎসবমগ্না, এমন সময় দাসী মন্থরার পরামর্শে দশরথের অন্যতমা মহিষী কৈকেয়ী অভিমানপূর্বক রোষাগারে প্রবেশ করেন। কিন্তু মধুসূদন তাঁহার কল্পনাকে ভিন্নপথে পরিচালিত করিয়াছেন; তিনি অভিমানিনী কৈকেয়ীকে ক্রোধাগারে না পাঠাইয়া তাঁহাকে দিয়া দশরথের উদ্দেশে এই লিপিখানি লিখাইয়াছেন। কাব্যের পক্ষে রামের রাজ্যাভিষেক কালই যে কৈকেয়ীর পক্ষে স্বামীর নিকট এইরূপ পত্র লিখিবার উপযুক্ত সময়, তাহা মধুসূদন নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং এমন নাটকীয় উপাদানে পূর্ণ সময়টিকে তিনি যে এইরূপ নাটকীয় পত্র লিখিবার উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন, ইহা হইতে তাঁহার রসবোধের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

দশরথ নিজের প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়াছেন; তাই তাঁহার সর্বাধিক প্রিয়তমা মহিষী অভিমানভরে সময়োপযোগী তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপবাণে দশরথের হৃদয়ে ঠিক যেভাবে আঘাত করা উচিত, তাহাই করিয়াছেন। মর্মপীড়িতা নারীর অন্তরের অভিমান যেন সমস্ত তীব্রতা লইয়া ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে—দুঃখ, ব্যঙ্গ এবং তিরস্কারে পত্রখানি পরম উপভোগ্য হইয়াছে। ইহাকে মুখরা নারীর পত্র বলিলে ভুল হইবে, কেননা, এই পত্রের প্রধান সুর হইল অভিমান এবং সেই অভিমানের বশে কৈকেয়ী তাঁহার অন্তরের সমস্ত দুঃখ ও জালাকে উজাড় করিয়া দিয়াছেন এবং দশরথকে তিনি ভয় প্রদর্শন করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই।

পত্রের আরম্ভ কৌতূহল ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া: "এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে, রঘুরাজ?" তাহার পর উৎসবের একটি সুদীর্ঘ বর্ণনা এবং প্রত্যেকটি বর্ণনার সঙ্গে রাণীর প্রশ্ন—হঠাৎ এই উৎসব কিসের জন্য? অকালে কোনো যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে কি? রঘু-কুল-রথী কোনো রিপু-বিনাশে সক্ষম হইয়াছেন? অথবা মহারাজের নূতন কোনো পুত্র জন্মিল না কি?—এইভাবে প্রশ্নের খোঁচায় কৈকেয়ীর ইঙ্গিত ব্যঙ্গ-বাণ ক্রমশঃ সূচীমুখ হইয়া উঠিতেছে। অবশেষে

চরম খোঁচায় বুনিয়াদ গঠিত হইল। এই জাতীয় মহোৎসব অবশ্যই কোনো বিবাহ সম্পর্কিত হইবে। কিন্তু কাহার বিবাহ? 'আইবড় আছে কি হে গৃহে দুহিতা?' —আছে, কি নাই, তাহা কি কৈকেয়ী জানেন না? খুবই জানেন। কিন্তু পুত্রকন্যার বিবাহের প্রয়োজন না থাকিলেই যে রাজা-রাজড়াদের পুরীতে আর বিবাহ-বাদ্য বাজিতে পারে না, এমন কথা কে বলিবে? রাজারা স্বয়ং তো যে-কোনো বয়সে বরবেশ ধারণ করিতে পারেন! বরং বৃদ্ধ বয়সে নব নব তরুণীলাভেই বুঝি তাঁহাদের অদম্য উৎসাহ! যদিও কৈকেয়ী জানেন, তাঁহার স্বামী রাজা হইয়াও ঋষির ন্যায়, তথাপি এত বড় সত্য তিনি যখন লঙ্ঘন করিয়াছেন, তখন তাঁহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। তাই অভিমানাহত মহিষীর রোষ-দৃপ্ত বাণী তীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইল:

'এ বয়সে পুনঃ
পাইলা কি ভাগ্য-বলে ভাগ্য-বান্ তুমি
চিরকাল!—পাইলা কি পুনঃ এ বয়সে—
রসময়ীনারী-ধনে কহ, রাজ-ঋষি?'

প্রকৃতপক্ষে রামায়ণের কৈকেয়ী অপেক্ষা মধুসূদনের কৈকেয়ী অনেক বেশী জীবন্ত। সেখানে কেবল মহিষীর ক্রোধের কথাই পাওয়া যায়, আর সেই ক্রোধের পরিচয়ের জন্য ক্রোধাগারই যথেষ্ট। কিন্তু এখানে এই লিপিকার মধ্যে কৈকেয়ীর মুখে যে সকল কথা বসানো হইয়াছে তাহাতে সত্যই কৈকেয়ীর এক নবমূর্তি গঠিত হইয়াছে। কেবল আপন পুত্রের রাজ্যলাভের আকর্ষণই রামায়ণের কৈকেয়ীর একমাত্র কথা। কিন্তু এখানে ঐ দাবী ছাড়া, যাহা আরও অনেক বড় হইয়া উঠিয়াছে তাহা হইল, সত্যের দাবী, ধর্মের দাবী। রাজা যদি এই সত্যরক্ষা ও ধর্মপালনে অবহেলা করিয়া থাকেন তবে তাঁর ধর্মমহিষী তাহা কেন সহ্য করিবেন? তাই আমরা পাই রাজারই প্রিয়তমা মহিষীর মুখে অপ্রিয় সত্য, কঠোর ভাষণ। স্বামী গুরুজন, না হইলে কৈকেয়ী মুক্তকণ্ঠে বলিতেন:

"অসত্য-বাদী রঘু কুল-পতি!
নির্লজ্জ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙেন সহজে!
ধর্ম্ম-শব্দ মুখে, গতি অধর্ম্মের পথে!"

রাজার প্রধান কাজ ন্যায় বিচার। সেই রাজাকে অন্যায় করিতে দেখিয়া কৈকেয়ী কঠিন বিচারকের ভূমিকার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার কথাকে অযথার্থ প্রমাণ করিবার ক্ষমতা যদি রাজার থাকে তবে যেন তাঁহাকে শিরশ্ছেদ বা নির্বাসনরূপ উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়। আর যদি রাজাই অন্যায় করিয়া থাকেন,

তবে অবশ্যই তিনি কলঙ্ক মাখিয়াছেন! কিন্তু কেন? কেনই বা তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, আর কেনই বা তাহা ভঙ্গ করেন? তবে কি প্রতিজ্ঞাকালে তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না? এই কথা ভাবিতেই ক্ষুব্ধা মহিষীর শিরায় শিরায় আগুন জ্বলিয়া উঠে। তাঁহার মনে পড়ে, তিন রাণীর মধ্যে রাজার সেবা-পরিচর্যা তাঁহার ভাগ্যেই অধিক ঘটে। আদরও তিনিই সর্বাপেক্ষা বেশী পাইয়াছেন। কিন্তু তবে কেন এখন সেই তাঁহারই প্রতি ঔদাসীন্য, তাঁহারই ন্যায্য দাবীর প্রতি নির্মম উপেক্ষা? তবে কি পূর্বের যত আদর-সোহাগ, মনস্তুষ্টিকর প্রতিজ্ঞা কেবল তাঁহারই যৌবনসুলভ সুখভোগের লালসা-প্রণোদিত? আজ বুঝি তিনি বিগত-যৌবনা বলিয়াই রাজার উপেক্ষার পাত্রী? এইরূপ একটি ধারণা মনের মধ্যে বসাইয়া দিয়া কবি কৈকেয়ীকে একেবারে ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় গর্জনের উপযোগী করিয়া তুলিলেন :

"না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভরে!"

ইত্যাদি বাক্যে রাজার কামুকতার প্রতি জঘন্য ইঙ্গিত সহ কৈকেয়ীর এক মর্মঘাতী পরিহাস বর্ষিত হইল।

কিন্তু কেবল অভিমান ও তিরস্কার বিষয়বস্তু নহে, কার্যোদ্ধারের আয়োজনও এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে দৃষ্ট হয়। যদি মোহভঙ্গ ঘটাইতে পারিলে রাজার মনের পরিবর্তন হয়, এই উদ্দেশ্যে অভিমানিনী কৈকেয়ী ধৈর্যসহকারে বৃদ্ধ রাজাকে পূর্বকথা স্মরণ করাইয়া দিয়া লিখিলেন :

"সেবিনু চরণ যবে তরুণ যৌবনে,
কি সত্য করিলা প্রভু, ধর্ম্মে সাক্ষি করি ;
মোর কাছে?"

তাহার পর সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, একথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে তিনি ইতস্ততঃ করিলেন না যে, রঘুকুলপতি দশরথকে তিনি সত্যবাদী বলিয়াই জানিতেন, কিন্তু আজ যুবরাজপদে রামকে অভিষিক্ত করিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া অধর্মের পথে চলিয়াছেন। অতএব এই পাপপুরীতে তিনি আর বাস করিবেন না। ভরত মাতুলালয়ে মানুষ হইবে সেও ভাল, তবু ইহা ত্যাগ করিয়া তিনি বনবাসেই যাইবেন। কিন্তু যদি ইহাতেও চৈতন্যোদয় না হয়, তাই অবশেষে আরম্ভ করিলেন ভয়প্রদর্শন :

দেশ দেশান্তরে
ফিরিব ; যেখানে যাব, কহিব যেখানে
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি।'

এই ভয়ঙ্কর প্রচারের জন্য কৈকেয়ীর প্রস্তাবিত কৌশলগুলি জড়-হৃদয়কেও কাঁপাইয়া দেয়। তিনি শুক-সারী পুষিয়া যত্ন করিয়া তাহাদের এই বোলই শিখাইবেন 'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি', আর শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ছাড়িয়া দিবেন, পক্ষিযুগল যত্রতত্র এক গানই গাহিয়া বেড়াইবে :

"গাইবে তারা বসি বৃক্ষ-শাখে'
'পরম অধর্ম্মচারী রঘু-কুল-পতি' !"

ইহা ছাড়া, তিনি স্বয়ং গাছের গায়ে, পর্বতগাত্রে ঐ চতুর্দশ অক্ষর খোদাই করিয়া উহাকে বিশ্বময় করিয়া দিবেন। পল্লীবালা-দলকেও এই বুলি শিখাইয়া পল্লীতে পল্লীতে এই প্রচারকার্য চালাইবেন :

করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া—
'পরম অধর্ম্মচারী রঘু-কুল-পতি' !

কী উৎকট উল্লাস ! কী দুর্দান্ত প্রস্তাব ! উদ্দেশ্য ? উদ্দেশ্য—আপন নামের এই কলঙ্ক প্রচারের ভয়ে যদি রাজা এখনও মত পরিবর্তন করেন।

কৈকেয়ী-পত্রিকায় দেখা যায়, এখানে কেবল মানিনী নায়িকার অভিমান অনুযোগই নহে, প্রকৃত বীরাঙ্গনা-সুলভ দৃপ্ততেজ ও দুঃসাহসিকতাও সুস্পষ্ট। মোহগ্রস্তের মোহভঙ্গের জন্য, অন্যায়-অধর্মের প্রতিকারের জন্য আঘাতের পর আঘাত হানিয়া এই পত্রিকা যেভাবে সুবিচার দাবী করিতেছে তাহাতে ইহার একটা অনন্যতা অবশ্যই স্বীকার্য। তবে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, কৈকেয়ী-চিত্র মধুসূদনের হাতে অতিমাত্রায় রুক্ষ ও রুদ্র হইয়াছে। যদিও পত্রিকাতে 'পতি-পদ-গতা যদি পতিব্রতা দাসী' এই জাতীয় দু'টি একটি নারীস্পর্শ আছে, তথাপি ইহার রুদ্ররসের অগ্নিস্রাবের মধ্যে নারীকণ্ঠের শীতলতা বাষ্পীভূত হইয়া যাওয়ায় ইহার পুরুষ প্রকৃতি আমাদের রসবোধে আঘাত করে :

"থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল ! দিয়া আশা মোরে
নিরাশ করিলে আজি ; দেখিব নয়নে
তব আশা বৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি ?"

সহধর্মিণীর মুখে এই জাতীয় অভিশাপ ও আতঙ্কের উদ্রেক ভারতীয় ভাবধারার বিরোধী বলিয়া মনে হয়।

সূর্পণখা-পত্রিকা

এই পত্রে এক বাল-বিধবার প্রেম-নিবেদন ব্যক্ত হইয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যে কবি যেমন রাক্ষসদিগকে রাক্ষস হিসাবে বর্ণনা করেন নাই, বীরাঙ্গনা কাব্যেও তেমনি তিনি তাঁহার নায়িকা সূর্পণখাকে ভীষণাকৃতি করিয়া কল্পনা করেন নাই। কবি তাই পত্রের প্রারম্ভে পাঠকদিগের উদ্দেশে বলিয়াছেন যে, এই পত্রিকাখানি পড়িতে হইলে বাল্মীকি-বর্ণিত বিকট-দর্শনা সূর্পণখাকে ভুলিতে হইবে এবং তাহাকে একজন সুন্দরী বিধবা রমণী হিসাবে কল্পনা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, কাব্যের অনুরোধেই কবি এই কথা বলিয়াছেন এবং প্রেমার্তা সূর্পণখাকে সুরূপা কল্পনা করিয়া তিনি কাব্যোচিত কার্যই করিয়াছেন। সূর্পণখা তাই মধুসূদনের এক নূতন সৃষ্টি এবং সার্থক সৃষ্টি।

পঞ্চবটী বন। রামচন্দ্র ও সীতার সঙ্গে সেই বনে থাকেন লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের তরুণ যৌবনের অনিন্দ্য সৌন্দর্য বাল-বিধবা সূর্পণখার মন হরণ করিয়াছে। সূর্পণখার মনে হইয়াছে লক্ষ্মণ একাকী এবং অবিবাহিত। এ-অবস্থায় তাহার পক্ষে বনবাসী লক্ষ্মণের নিকট প্রেম-নিবেদন আদৌ অসঙ্গত নয়। দূর হইতে লক্ষ্মণকে দেখিয়া তাহার ভাল লাগিয়াছে এবং লালসায় অধীর হইয়া সে পত্রদূতী মারফৎ তাহার অন্তরের প্রেম প্রগল্ভ ভাষায় নিবেদন করিয়াছে ; লালসা যেখানে প্রেরণা যোগাইয়াছে, সেখানে ইহার ছত্রে যে রূপজমোহ ফুটিয়া উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। তবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মধুসূদনের হাতে পড়িয়া সূর্পণখার পূর্বরাগ এক অপূর্ব কবিত্বসুষমায় মণ্ডিত হইয়াছে। রাক্ষস-কন্যা হইলেও তাহার হৃদয়ে যে প্রেম থাকিতে পারে এবং সে প্রেমের অনুরাগ-রঞ্জিত অভিব্যক্তি থাকিতে পারে, কবি সূর্পণখা-পত্রিকায় তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন :

> "কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু
> বাঞ্ছা তব ? অনিমেষে রূপ তার ধরি,
> (কামরূপা আমি, নাথ) সেবিব তোমারে !"

সূর্পণখা যে মায়ারূপ ধারণপূর্বক রূপসী সাজিতে পারে, কবি এখানে তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছেন।

প্রথম দর্শনেই সূর্পণখা লক্ষ্মণকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। নবযৌবন লক্ষ্মণ শিরে জটাজূট রাখিয়া, ফলমূল খাইয়া পঞ্চবটী বনে ভ্রমণ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া সূর্পণখার শুধু কৌতূহলই জাগে নাই, সেই সঙ্গে তাহার বুকও ফাটিয়া যাইতেছে।

লক্ষ্মণ রাত্রে ভূতলে শয়ন করিয়া থাকেন, ইহা মনে করিয়া সূর্পণখা তাহার স্বর্ণশয্যা ত্যাগ করিয়া বিনিদ্র রজনী যাপন করে; লক্ষ্মণ ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করেন ইহা ভাবিয়া উপাদেয় রাজভোগ সূর্পণখার মুখে রুচে না—এ-সবই পূর্বরাগের লক্ষণ। যে দুঃখেই লক্ষ্মণ উদাসীনের বেশে বনে বাস করুন না কেন, সূর্পণখা তাহা দূর করিতে প্রস্তুত, শুধু লক্ষ্মণ একবার মুখ ফুটিয়া বলিলেই হয়। এইজন্য পত্রে সে লক্ষ্মণকে অপরিমিত ঐশ্বর্য-সুখের প্রলোভন দেখাইয়াছে:

"দিব সেনা ভব-বিজয়িনী,
রথ, গজ, অশ্ব, রথী—অতুল জগতে!
... ...
যদি অর্থ চাহ,
কহ শীঘ্র;—অলঙ্কার ভাণ্ডার খুলিব
তুষিতে তোমার মনঃ।"

পার্থিব বিষয়-বৈভবের তো কথা-ই নাই, যদি লক্ষ্মণ ইচ্ছা করেন, তবে সূর্পণখা লক্ষ্মণকে স্বর্গের সুখও আস্বাদন করাইতে সক্ষম। আর, তাহার প্রেমাস্পদ যদি পার্থিব ও স্বর্গীয়—উভয়বিধ সুখের প্রতি উদাসীন থাকিয়া এইরূপ কৃচ্ছ্রময় জীবন যাপন করিতে মনস্থ করিয়া থাকেন, তবে সূর্পণখাও তাঁহার কৃচ্ছ্রতার অংশভাগিনী হইতে প্রস্তুত:

"অম্লান বদনে,
এ বেশ ভূষণ ত্যজি উদাসীন-বেশে
সাজি, পূজি উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব!
... ...
দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগিছে দুজনে!"

লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখার অনুরাগ যে আন্তরিক, তাহার প্রমাণ লক্ষ্মণের জন্য সে সকল সুখ-সম্পদ-রিক্তা হইতেও কুণ্ঠিতা নহে। প্রেমের গভীরতার চিত্র-অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত কবি তাই সূর্পণখার প্রেমের লালসাই প্রদর্শন করেন নাই, সেই সঙ্গে তাহার অনুরাগের অকপটতার কথাও বলিয়াছেন। সূর্পণখার প্রেমের প্রগাঢ়তা বুঝাইবার জন্য কবি তাহার মুখ দিয়া শেষে এমন কথাও বলাইয়াছেন যে, সূর্পণখা যে সত্যই রূপসী, একথা যদি লক্ষ্মণের বিশ্বাস না হয় তবে তিনি যেন আসিয়া স্বচক্ষে তাহাকে একবার দেখিয়া যান। আসিয়া যদি দেখেন যে রূপহীনা, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে ফিরিয়া যাইতে পারেন:

"কি রূপ বিধাতা
দিয়াছেন, আশু আসি দেখ, নরমণি!
আইস মলয়-রূপে; গন্ধহীন যদি
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইও তখনি!"

স্থূর্পণখা পত্রে নিজের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সে রাবণের ভগিনী ; ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে আজন্ম-লালিতা ; কিন্তু প্রেমাস্পদের জন্য আজ সে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। এই ত্যাগের মধ্যে যে আনন্দ, যে আশা, কবি তাহাও শেষে স্থূর্পণখার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন ঃ

> "ক্ষম অশ্রু চিহ্ন পত্রে ; আনন্দে বহিছে
> অশ্রুধারা !"

রাক্ষস কন্যা হইলেও স্থূর্পণখার হৃদয়ে যে প্রকৃত অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার অশ্রুধারা সে স্বাক্ষ্য বহন করিতেছে। রাক্ষসীকে প্রেমময়ী করিয়া কবি যে রোমান্টিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন তাহা আমাদের মুগ্ধ করে। Situation সৃষ্টির অভিনব কৌশলে কবি অরণ্য ও নগর, মানুষ ও রাক্ষস, সেকাল ও একালকে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন।

দ্রৌপদী-পত্রিকা

প্রোষিতভর্তৃকার হৃদয়ের বেদনা এই পত্রে ছত্রে ছত্রে ঝঙ্কৃত হইয়াছে এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিরহের করুণ সুরে লিপিখানি মণ্ডিত। কিন্তু তাহার সঙ্গে ঈষৎ ব্যঙ্গের খাদ মিশিয়া সমগ্র পত্রখানিকে অন্য একরূপ মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়াছে। শকুন্তলার বিরহ আর দ্রৌপদীর বিরহ এক নহে ; এই দুইজনের কথা পাশাপাশি উঠে এইজন্য যে, ইহারা উভয়েই প্রোষিতভর্তৃকা, উভয়েই স্বামীর বিস্মরণে উৎকণ্ঠিতা এবং উভয়েই মিলনের আকাজ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব। কিন্তু ক্ষণেকের মিলন চিরজীবনের হইবে কিনা, এই আশঙ্কায় শকুন্তলা-হৃদয় কণ্টকিত, আর সহধর্মিণীর শাশ্বত প্রণয়কে লীলা-ঐশ্বর্যে মধুময় করিয়া তুলিবার জন্য দ্রৌপদীর অন্তর বুভুক্ষু।

পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাহ হইবার পর ভাগ্য বিড়ম্বনায় দ্রৌপদীকে পঞ্চ-স্বামীর সহিত বনবাসে যাইতে হইয়াছিল। এই বনবাসকালেই অর্জুন বৈরনির্যাতনের উদ্দেশ্যে স্বর্গে গমন করেন এবং সুদীর্ঘকাল সেখানে অতিবাহিত করেন। পঞ্চ-স্বামীর মধ্যে তৃতীয় পাণ্ডব ছিলেন দ্রৌপদীর সর্বাপেক্ষা প্রিয়। একে বনবাস, তাহার উপর প্রিয়তম স্বামীর অনুপস্থিতি—বিরহ-পত্রিকা লিখিবার উপযুক্ত অবসর। একেই তো তিনি পাণ্ডবদিগের সহিত মনোদুঃখে বনবাস করিতেছিলেন, তাহার উপর প্রিয়তম পতির এই সুদীর্ঘ প্রবাস! এই অবস্থায় বিরহখিন্না নারীর মনে যেরূপ ভাবের উদয় হওয়া স্বাভাবিক, কবি ঠিক সেইরকম ভাবই দ্রৌপদীর লেখনীমুখে অনবদ্য ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

অর্জুন স্বর্গে ইন্দ্রালয়ে ইন্দ্রের প্রিয় অতিথি। সেখানে ভোগসুখের প্রাচুর্য যেমন প্রলোভনের সামগ্রীও তেমনি বিস্তর। এই সকল ভাবিয়া এবং স্বামীর বহুপত্নীত্বের কথা স্মরণপূর্বক বিরহিণী দ্রৌপদীর স্বভাবতঃই মনে হইয়াছে ঃ

"হে ত্রিদশালয়-বাসি, পড়ে কভু মনে
এ পাপ সংসার আর? কেন বা পড়িবে?
কি অভাব তব, কান্ত, বৈজয়ন্ত-ধামে?
দেব-ভোগ-ভোগী তুমি, দেবসভা মাঝে
আসীন দেবেন্দ্রাসনে! সতত আদরে
সেবে তোমা সুরবালা,—"
... ...
"শত ফুল প্রফুল্ল যে বনে,
কি সুখে বঞ্চিত, সখে, শিলীমুখ তথা?"

কিন্তু স্বর্গ যত সুন্দরই হউক, সেখানকার আদর-যত্নে অর্জুন ভুলিয়া থাকিবেন, এ ধারণা দ্রৌপদীর পক্ষে দুর্বিষহ ; তাই অভিমানিনীর খেদোক্তি দেখা দিল,—

'অভাগী দাসীর কথা পড়ে তব মনে?' আর মনে না পড়িলেই কি তিনি ছাড়িবেন? আসল নিবেদনের পূর্বে সর্বাগ্রে তিনি আশীর্বাদের দাবীতে প্রণাম জানাইবেন। তখন তাঁহার পরিচয় প্রেমময়ী প্রণয়িনী নহে, অতি সন্তর্পণে 'দ্রুপদ নন্দিনী' দাসী' মাত্র।

"—আশীর্ব্বাদ কর
নমে পদে, ধনঞ্জয়, দ্রুপদ নন্দিনী—
কৃতাঞ্জলি-পুটে দাসী নমে তব পদে!"

কিন্তু অনতিবিলম্বে নামিয়া আসিল দুর্বার হৃদয়াবেগ। ভারতীয় নারী কতক্ষণ স্বামী-বিরহ সহ্য করিতে পারে? মান-অভিমানের মধ্যে যে বুক ফাটিয়া যায়। তাই আমরা দেখি, এই মুহূর্তে দূর হইতে প্রণামকারিণী দ্রুপদ নন্দিনীর "ধনঞ্জয়" পর-মুহূর্তেই কণ্ঠলগ্না প্রণয়িনীর "প্রাণকান্ত" হইয়া উঠিলেন। বক্ষ উজাড় করিয়া বাহির হইতে চাহিল দ্রৌপদীর মর্মবাণী।

অর্জুনের বিরহে দ্রৌপদীর পৃথিবী যে অন্ধকার ঃ

"আঁধার বিশ্ব এ পোড়া নয়নে
হায় রে, আঁধার নাথ, তোমার বিরহে—
জীবশূন্য, রবশূন্য, মহারণ্য যেন!"

বাঁধ-ভাঙা স্রোতের মত বহিয়া চলিল বিরহিণীর হৃদয়োচ্ছ্বাস। প্রেমাসিক্ত অন্তরের কোনো অলিতে-গলিতে যদি এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট আলোকপাত না হইয়া

থাকে, যদি বহু-স্বামিত্বের দুর্ভাগ্যের আওতায় দ্রৌপদী-হৃদয়ের নিভৃত-কন্দরখানি অর্জুনের পক্ষে নিখুঁতভাবে দেখিয়া লওয়ার কোনো বাধা হইয়া থাকে, এই আশঙ্কায়, সতীশিরোমণি দ্রৌপদী স্পষ্ট করিয়া প্রাণ খুলিয়া জানাইলেন :

"পাঞ্চালীর চির-বাঞ্ছা, পাঞ্চালীর পতি
ধনঞ্জয়! এই জানি, এই মানি মনে।"

ভাগ্য-বিড়ম্বনায় পঞ্চ-স্বামী হইয়াছে বলিয়া কি দ্রৌপদী শাশ্বত নারী-ধর্ম—সতী-ধর্ম পালন করিতে পারিবেন না? উহা যে তাঁহার অন্তরের অন্তস্থল হইতে জাগিয়া উঠিতেছে; শাস্ত্রীয় অনুশাসন কি তাহাকে চাপিয়া রাখিতে পারে? বীরাঙ্গনার ন্যায় তাই তিনি প্রচলিত ধর্মের অনুশাসন অগ্রাহ্য করিতে ও তাহার ফলস্বরূপ যে-কোনো শাস্তি মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত :

"যা ইচ্ছা করুক ধর্ম্ম, পাপ করি যদি
ভালবাসি নৃমণিরে,—যা ইচ্ছা নৃমণি
হেন সুখ ভুঞ্জি, দুঃখ কে ডরে ভুঞ্জিতে?"

পত্রিকাখানি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ভাবাবেগে পূর্ণ—ভাবের দ্রৌপদী বিবাহের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক কথা অতি সংক্ষেপে এবং সুন্দভাবে মণ্ডিত করিয়া বলিয়াছেন এবং তাহার ফাঁকে ফাঁকে দ্রৌপদীর পূর্বরাগও চমৎকার ফুটিয়াছে।

শেষে অর্জুনকে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে বলিবার সময়, স্বর্গের দুর্লভ পারিজাত কুসুম গোটাকতক আনিবার অনুরোধ করিতেও ভুলেন নাই :

"ইচ্ছা বড় গুণমণি পরিতে অলকে
পারিজাত; যদি তুমি আন সঙ্গে করি,
দ্বিগুণ আদরে ফুল পরিব কুন্তলে!"

ইহাই তো স্ত্রীচরিত্র এবং কবি ইহার সুন্দর বিশ্লেষণ দিয়াছেন। বৃহৎ অনুরোধের সহিত কি সুন্দর স্ত্রীসুলভ এই সামান্য অনুরোধটি! একদিকে বিরহে কণ্ঠাগত হৃদয়, স্বামীকে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে বলা হইতেছে; আবার সেই সঙ্গে পারিজাত-ফুলের জন্য অনুরোধ!

উপসংহারে অর্জুনের অভাবে তাঁহারা কিভাবে বনবাসে কাল কাটাইতেছেন সে-সকল কথা বলিয়া অর্জুনের মর্ত্যে ফিরিবার ইচ্ছাকে আরও বলবতী করিয়া তুলিবার জন্য দ্রৌপদী লিখিতেছেন :

"পাণ্ডব-কুল-ভরসা, মহেষ্বাস, তুমি!
বিমুখিবে তুমি, সখে, সম্মুখ সমরে
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শূরে; নাশিবে কৌরবে!"

বসাইবে রাজাসনে পাণ্ডু-কুল-রাজে ;—
এই গীত গায় আশা নিত্য এ আশ্রমে !
এই সঙ্গীত ধ্বনি, দেব, শুনি জাগরণে !
শুনি স্বপ্নে নিশাভাগে এ সঙ্গীত-ধ্বনি !"

এই যে সুমধুর কান্তা-বাক্য ও আশার বাণী—ইহা একদিকে যেমন দ্রৌপদীর প্রেমকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি সমগ্র পত্রখানিকে এক অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছে। প্রিয়তমা পত্নীর মুখে এমন উত্তেজনাময় আশার বাণী শুনিয়া কোন্ স্বামীর হৃদয় উল্লসিত না হয়? এই উৎসাহেই অর্জুন পত্রের উত্তর না দিয়া, একেবারে পত্রবাহকের সঙ্গে মর্ত্যে ফিরিয়া আসিবেন—এই আশা লইয়া দ্রৌপদী পত্র শেষ করিয়াছেন।

কিন্তু এই শেষ লেখনীসম্পাতেও কত মাধুর্য, কত নৈপুণ্য! এখানকার নাটকীয়তা পাঠককে মুগ্ধ করে। সাধারণ নিয়মে স্বামীকে উত্তর লিখিবার অনুরোধ জানাইয়া পত্র শেষ করা হইল, কিন্তু তন্মুহূর্তে সেই প্রেম-প্রৌঢ়ার মনে পড়িল তাঁহার পতি-প্রেম তো সামান্য নহে, তবে কেন জগতের মাঝে উহাকে সামান্য করি? অমনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, যেন ভুল হইয়াছে ঐ ভাবে অনুরোধ করা—যেন তাঁহার আকর্ষণী শক্তি সম্বন্ধে তিনি নিজেই তেমন সচেতন হইতে পারেন নাই, এখনই উহা অন্তরে অনুভব করিলেন। আমরা যেন চোখের উপর দেখিতে পাই নায়িকা সহসা আত্ম-সচেতন হইয়া প্রেম-চটুল নয়নে সহাস-বয়ানে থমকিয়া দাঁড়াইলেন ; মুখে ফুটিল আত্মসচেতন বাণী :

"কি কহিনু, নরোত্তম? কি কাজ উত্তরে?
পত্রবহ সহ ফিরি আইস এ বনে!"

ভানুমতী-পত্রিকা

কুরুক্ষেত্রের মহাসমর আরম্ভ হইয়াছে। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমবেত হইয়াছে এবং তাহাদের সঙ্গে ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গ আসিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের পক্ষে সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন। কুরুকুলের সমস্ত বীরাগ্রগণ্য যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছেন। অন্তঃপুরে আছেন শুধু অসহায় নারীবৃন্দ। আর আছেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার মহিষী গান্ধারী। দুর্যোধন-স্ত্রী সেই নারীদের মধ্যে একজন। প্রতিদিন সঞ্জয় যুদ্ধের সংবাদ ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতেছেন। রাজসভার অন্তরালে থাকিয়া অন্যান্য পুরনারীদের সঙ্গে ভানুমতীও তাহা শুনিয়া থাকেন। যুদ্ধের সংবাদ

নিয়ত শ্রবণ করিয়া ভানুমতীর পক্ষে অধীর হওয়া স্বাভাবিক। তাঁহার ব্যাকুল নারী-হৃদয়ে স্বামীর অমঙ্গল-আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়েই ভানুমতীর পক্ষে স্বামীকে এই ভীষণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য পত্র লিখিবার উপযুক্ত অবসর। এমন নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে লিপিমুখে স্বামীর নিকট কান্তা-বাক্য প্রেরণের সার্থকতা কবি নিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

স্বামী যেদিন যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন, ভানুমতী সেইদিন হইতেই অধীর এবং এই অধৈর্য ও উৎকণ্ঠা লইয়া তাঁহার পত্র শুরু হইয়াছে:

> "অধীর সতত দাসী, যে অবধি তুমি
> করি যাত্রা পশিয়াছ কুরুক্ষেত্র-রণে!"

এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের অবস্থা এবং স্বামীর অমঙ্গলচিন্তায় ভানুমতী-হৃদয়ের চঞ্চলতা কবি বেশ নিপুণতার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন:

> "কভু যাই দেবালয়ে; কভু রাজোদ্যানে;
> কভু গৃহ-চূড়ে উঠি, দেখি নিরখিয়া
> রণ-স্থল। রেণু-রাশি গগন আবরে
> ঘন ঘনজালে যেন; জ্বলে শর-রাশি,
> বিজলীর ঝলা সম ঝলসি নয়নে!"

তাহার পরই ভানুমতী দুর্যোধনকে লিখিয়া জানাইতেছেন যে, এই কাল-যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে কৌরবের অন্তঃপুরের নারীদের নয়নে কেবলই অশ্রু ঝরিতেছে। সদ্যো বিধবাদের ক্রন্দন তো আছেই, তা ছাড়া সধবারাও আসন্ন বৈধব্যে আশঙ্কিত হইয়া দিবারাত্র কাঁদিতেছে:

> "কাঁদে কুরু-বধূ যত! কাঁদে উচ্চ-রবে,
> মায়ের আঁচল ধরি কুরু কুল শিশু,
> তিতি অশ্রুনীরে, হায় না জানি কি হেতু!
> দিবানিশি এই দশা রাজ-অবরোধে।"

কৌরবের অন্তঃপুরে আবাল-বৃদ্ধ বণিতার এই মানসিক চাঞ্চল্য, এই দিবারাত্র মর্মন্তুদ ক্রন্দনধ্বনি—পত্রের আরম্ভেই ইহার উল্লেখ, এত স্বাভাবিক এবং সংগত হইয়াছে যে, ইহাতে কবির অনুভূতির প্রখরতা দেখিয়া সত্যই বিস্মিত হইতে হয়, ভানুমতী-পত্রিকার আরম্ভ আর কোন প্রকারেই হইতে পারিত না।

ভানুমতী যেদিন হইতে কৌরবের অন্তঃপুরে আসিয়াছেন সেদিন হইতেই তিনি পাণ্ডবদিগের প্রতি তাঁহার ঈর্ষাকাতর স্বামী দুর্যোধনের কুব্যবহার দেখিয়া আসিতেছেন; আবার হিংসাপরতন্ত্র কৌরবদিগের প্রতি উদারহৃদয় পাণ্ডবদিগের

সদ্ব্যবহারও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। আজ দুর্যোধন ক্রূরবুদ্ধি শকুনির প্ররোচনাতেই সেই পাণ্ডবদিগের বিনাশের জন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছেন—এই কথা মনে করিয়া ভানুমতী স্বামীকে লিখিতেছেন :

"কুক্ষণে মাতুল তব—ক্ষম দুঃখিনীরে !—
কুক্ষণে মাতুল তব, ক্ষত্র-কুল-গ্লানি,
আইল হস্তিনাপুরে! কুক্ষণে শিখিলা
পাপ অক্ষবিদ্যা, নাথ, সে পাপীর কাছে !"

শকুনি যে সাক্ষাৎ কলি এবং অধর্ম, সে কথাও তিনি স্বামীকে স্মরণ করাইয়া দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। ভানুমতীর মন স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছে যে, দুর্যোধন কুরুকুলের কুপুত্র হইলেও দুষ্টমতি শকুনির ও উদ্ধত প্রকৃতি কর্ণের পরামর্শেই তাঁহার হিতাহিত বুদ্ধি একেবারেই লোপ পাইয়াছে। সাধ্বীর অন্তরে আসন্ন ভবিষ্যতের ছায়াপাত হইয়াছে—তিনি যেন জানিতে পারিয়াছেন, এ যুদ্ধে কৌরবের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী এবং ভানুমতীর অদৃষ্টে বৈধব্য অনিবার্য। দিবারাত্র এই কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেও পারেন না। নিদ্রার জন্য চক্ষু মুদিলেই তিনি দুঃস্বপ্ন দেখেন :

"শ্বেত-অশ্ব কপিধ্বজ স্যন্দন সম্মুখে !
রথমধ্যে কালরূপী পার্থ! বাম করে
গাণ্ডীব,—কোদণ্ডোত্তম। ইরম্মদ-তেজা—
মর্ম্মভেদী দেব-অস্ত্র শোভে হে দক্ষিণে !

দুর্বুদ্ধিগ্রস্ত এবং হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য স্বামীকে বুঝাইবার জন্য ভানুমতী লিখিতেছেন যে, যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ, ভীমসেন 'ভীম-পরাক্রমী শূর', পার্থ 'দেব-নর-পূজ্য' দ্রৌপদী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী—ইহাদের সকলকে ত্যাগ করিয়া দুর্যোধন গঙ্গাজলপূর্ণ ঘট ঠেলিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার পরিণতি কিছুতেই কল্যাণপ্রদ হইতে পারে না; তাই ভানুমতী স্বামীর নিকট ঐকান্তিক মিনতিসহকারে লিখিতেছেন যে, এখনও সময় আছে :

"এখনও দেহ ক্ষমা, এই ভিক্ষা মাগি,
ক্ষত্রমণি !"

এইরূপে দিবারাত্র স্বামীর প্রাণনাশভয়ে ভীতা ভানুমতী এক রাত্রিতে স্বপ্নে কর্ণের নিধন এবং দুর্যোধনের উরুভঙ্গ প্রভৃতি অমঙ্গলসূচক যে সকল ভবিষ্যৎ ঘটনা দেখিয়াছিলেন, পত্রে তাহারও উল্লেখ করিতে তিনি দ্বিধা করেন নাই :

"দেখিনু তরাসে
যত দূর চলে দৃষ্টি, ভীম রণভূমি !
বহিছে শোণিত-স্রোত প্রবাহিণীরূপে,
পড়িয়াছে গজরাজি শৈলশৃঙ্গ যেন
চূর্ণ বজ্রে ; হতগতি অশ্ব ; রথাবলী
ভগ্ন ; শত শত শব !"

তাহার পর এই সব ভাবী দুর্ঘটনার করালছায়ায় বিষণ্নচিত্তা ভানুমতী হিতাকাঙ্ক্ষিণী স্ত্রীর ন্যায় স্বামীকে অনুরোধ জানাইয়া পত্রশেষে বলিতেছেন যে, এ যুদ্ধে আর কাজ নাই ঃ

"এস তুমি, প্রাণনাথ, রণ পরিহরি !
পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরথী !
কি অভাব তব, কহ ? তোষ পঞ্চ জনে ;
তোষ অন্ধ বাপ মায়ে ; তোষ অভাগীরে ;—
রক্ষ কুরুকুল, ওহে কুরুকুলমণি !"

এইভাবে পত্রিকাখানিতে সাধ্বী স্ত্রীর উৎকণ্ঠা নিপুণভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে।

দুঃশলা-পত্রিকা

দুঃশলা ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা এবং জয়দ্রথের পত্নী। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় শ্যালক দুর্যোধনের অনুরোধে সিন্ধুপতি জয়দ্রথ নিজ রাজ্য হইতে আসিয়া শ্যালকের পক্ষে যোগ দিয়াছেন। তাঁহার পত্নী দুঃশলাও স্বামীর সহিত আসিয়া পিতৃগৃহে বাস করিতেছেন। ভানুমতী যেমন স্বামীর জন্য, তিনিও তেমনি পিতৃকুলের জন্য চিন্তিতা ; তবে দুঃশলার উৎকণ্ঠা তাঁহার স্বামীর জন্যই অধিক এবং ইহাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। প্রতিদিন সঞ্জয় যখন ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের বর্ণনা করিতেন, তখন উৎকণ্ঠিতা কন্যাও পিতার নিকট বসিয়া ইহা শুনিতেন।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভানুমতী কুরুকুলের বধূ। তাঁহার পক্ষে অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধবার্তা শ্রবণ করাই সঙ্গত। কিন্তু দুঃশলা এ-পরিবারের কন্যা, তাই তাঁহার লিপির আরম্ভে আছে ঃ

"মধ্যাহ্নে বসিনু
অন্ধ পিতৃপদতলে, সঞ্জয়ের মুখে
শুনিতে রণের বার্ত্তা।"

মধুসূদনের কবিদৃষ্টিতে বাড়ির বধূ ও কন্যার আচরণের এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু এড়াইয়া যায় নাই।

একদিন সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের বিবরণ শুনিতে শুনিতে দুঃশলা অভিমন্যু-বধের কথা জানিতে পারিলেন। অভিমন্যু অর্জুনের বীরপুত্র। কৌরবের ব্যূহ ভেদ করিয়া অভিমন্যু প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন। কুরুপক্ষের সপ্তরথীর কেহই তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। পরে সেই সপ্তরথী একসঙ্গে মিলিয়া অভিমন্যুকে বধ করিলেন। সেই ব্যূহমুখ রক্ষা করিতেছিলেন জয়দ্রথ; বীর অভিমন্যু তাই ব্যূহ হইতে বাহির হইতে পারিলেন না। অভিমন্যুবধের সংবাদ যখন পাণ্ডব-শিবিরে গিয়া পৌঁছিল তখনই অর্জুন সকলের সম্মুখে পরদিবসের যুদ্ধে সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। সঞ্জয়ের বর্ণনায় ভীমবাহু অর্জুনের প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা বড় তীব্রভাবে ফুটিয়াছে :

"কোথা জয়দ্রথ এবে,—রোধিল যে বলে
ব্যূহমুখ ? শুন, কহ, ক্ষত্ররথী যত ;
তুমি, হে বসুধা, শুন ; তুমি জলনিধি ;
তুমি, স্বর্গ, শুন ; পাতাল, পাতালে ;
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, জীব এ জগতে
আছে যত, শুন সবে ? না বিনাশি যদি
কালি জয়দ্রথে রণে, মরিব আপনি !
অগ্নিকুণ্ডে পশি তবে যাব ভূতদেশে,
না ধরিব অস্ত্র আর এ ভব-সংসারে !"

দুঃশলা-পত্রিকা-রচনার ইহাই পটভূমিকা এবং উৎকণ্ঠিতা স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে পত্র লিখিবার ইহাই যে উপযুক্ত অবসর তাহা বলা বাহুল্য। প্রথমেই দুঃশলা-পত্রিকার বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটন করা দরকার। বীরাঙ্গনা-কাব্যের মধ্যে যে চারিজনকে প্রোষিতভর্তৃকার পর্যায়ে গণনা করা যায়, দুঃশলা তাঁহাদের মধ্যে একজন : আর তিন জন হইলেন, শকুন্তলা, দ্রৌপদী ও ভানুমতী। ইহাদের মধ্যে আবার, প্রথম দুইজন, অর্থাৎ শকুন্তলা ও দ্রৌপদীকে এক পৃথক্ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়, যেহেতু তাঁহাদের কেবল স্বামীর দর্শন লাভের বিলম্ব বা বাধাবিঘ্নই হইল উৎকণ্ঠার মূল, সেখানে প্রাণ বিপন্ন হওয়ার কোন আশঙ্কা ছায়াপাত করে নাই। কিন্তু ভানুমতী ও দুঃশলার ক্ষেত্রে এই অমঙ্গলের ছায়া দেখা দিয়াছে। উভয়েরই স্বামী কুরুক্ষেত্র মহাসমরের কালাগ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছেন, সুতরাং যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত বলিয়া উভয়েরই অন্তরে দেখা দিয়াছে এক বিরাট আতঙ্ক। অথচ স্বামী উভয়েরই এক এক প্রখ্যাত বীর; ক্ষাত্রবীর্যে উদ্দীপ্ত বীরকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করে কাহার সাধ্য ? তাই এখানকার নায়িকাদের পত্রে নায়িকাসুলভ প্রেমস্পর্শ, ভাববিলাস বা আবদার

বলিয়া কিছু দেখা দিবার অবসর নাই, আছে কেবল অশ্রুসজল কাকুতি-মিনতি। এই দুইখানির মত এমন করুণ অশ্রুপ্লুত পত্রিকা বীরাঙ্গনা কাব্যে আর নাই।

কিন্তু তথাপি দুঃশলা ও ভানুমতী পত্রিকার প্রকৃতি অভিন্ন নহে। ভানুমতীর আশঙ্কা সমস্তই অনুমানসম্ভূত এবং বিশেষ করিয়া স্বপ্ন-প্রণোদিত। প্রবলপক্ষের বিরুদ্ধে স্বামী যুদ্ধে মাতিলে এবং অধর্মের আশ্রয়ে জয়লাভ করিতে প্রয়াসী হইলে যেমন যে-কোন নারীর পক্ষে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক, ভানুমতীও তাহাই হইয়াছেন। এখানে ইহার জবাবে বা সান্ত্বনায় বলা যায়, ইহা নারীর দুর্বলতা মাত্র। যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত বলিয়া তো আর শঙ্কিত হইয়া যুদ্ধত্যাগ করা যায় না? তাহাতে যে স্বামীকে কাপুরুষ বলিয়া কলঙ্কিত হইতে হয়। কিন্তু দুঃশলাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কিছু নাই। তাঁহার আশঙ্কা অনুমানগত নহে; তিনি তাঁহার দুর্ভাগ্যকে একেবারে নগ্ন দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছেন। ভানুমতী তাঁহার দুঃস্বপ্নে কৌরবপক্ষীয় নানা মহারথীর পতন-দৃশ্যের মধ্যে দেখিয়াছেন 'রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি ভগ্ন-উরু!' ইহাতেই যে তিনি আপন স্বামীর 'ভগ্ন-উরু' দশা বুঝিয়াছেন তাহা হইতে পারে না; সমগ্র স্বপ্নটি তাঁহার স্বামীপক্ষের অমঙ্গলসূচক এই পর্যন্ত। তাহা ছাড়া স্বপ্ন স্বপ্নমাত্র। কিন্তু দুঃশলার ক্ষেত্রে স্বপ্নও নহে, অস্পষ্ট ইঙ্গিতও নহে, একেবারে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছেন পার্থের প্রতিজ্ঞা-বাণী; আর সকলের ন্যায় তিনিও জানেন পার্থের প্রতিজ্ঞা অলঙ্ঘ্য,—পরদিন সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথ-বধ কেহই রোধ করিতে পারিবে না। সুতরাং নারীর চরম দুর্ভাগ্য—অকাল-বৈধব্য—দুঃশলার পক্ষে অবধারিত; আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা তিনি এয়োতির চিহ্নধারণে অধিকারিণী, তাহার পর চিরজীবনের মত উহা অবলুপ্ত হইবে। তাই এই অবধারিত হতভাগ্যের করাল ছায়ায় দাঁড়াইয়া এই পরম সতী আপনার অপনীয়মান পতি-সৌভাগ্যকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া রাখিবার যে শেষ চেষ্টাটি করিয়াছেন তাহাই দুঃশলা-পত্রিকায় সকরুণ সুরে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। ইহার অনুরূপ সুরের মূর্ছনা বীরাঙ্গনা কাব্যের আর কোথাও মিলিবে না। পুত্রশোকে মহাক্রোধান্ধ, প্রচণ্ড-গাণ্ডীবধারী অর্জুনের এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া দুঃশলার মনের অবস্থা কি হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অর্জুনের প্রতিজ্ঞার ফলে জয়দ্রথের নিধন যে অনিবার্য তাহা ভাবিয়া দুঃশলা জ্ঞান হারাইলেন :

> "অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদতলে
> পড়িনু! যতনে মোরে আনিয়াছে হেথা—
> এই অন্তঃপুরে—চেড়ী পিতার আদেশে।"

পরে জ্ঞানলাভ হইলে দুঃশলা কান্তা-বাক্যে স্বামীকে নানাভাবে বুঝাইয়া এই যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া ফিরিয়া আসিতে বলেন। পত্রে দুঃশলার পক্ষে যেরূপ যুক্তিজাল বিস্তার করা স্বাভাবিক, কবি তাঁহার লেখনীমুখে ঠিক তাহাই ফুটাইয়াছেন। এমন কি, তাঁহার স্বামী যে একবার দ্রৌপদীহরণ করিয়াছিলেন, সে কথাও দুঃশলা জয়দ্রথকে স্মরণ করাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

এই কাল-সমরে কৌরবের বিনাশ যে নিয়তি-নির্দিষ্ট ব্যাপার, তাহার আভাস দুর্যোধনের জন্মক্ষণেই পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার জন্মের সময় যে-যে অমঙ্গলসূচক ঘটনা ঘটিয়াছিল, দুঃশলা যেমন শুনিয়াছিলেন, সাধ্বী পত্নীর ন্যায় পতির নিকট তাহা উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না :—

"শুনিয়াছি আমি, যে দিন জন্মিলা
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অমঙ্গল ঘটিল সে দিনে!
নাদিল কাতরে শিবা : কুকুর কাঁদিল
কোলাহলে ; শূন্যমার্গে গর্জিল ভীষণে
শকুনি গৃধিনীপাল !"

এমন 'অলক্ষুণে' পুত্রকে ত্যাগ করিবার জন্য মহামতি বিদুর যে ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, দুঃশলা তাহাও সরলপ্রাণে উল্লেখ করিলেন :

"কহিলা জনকে
বিদুর,—সুমতি তাত ! 'ত্যজ এ নন্দনে,
কুরুরাজ ! কুরুবংশ-ধ্বংসরূপে আজি
অবতীর্ণ তব গৃহে !' না শুনিলা পিতা
সে কথা ! ভুলিলা, হায়, মোহের ছলনে !
ফলিল সে ফল এবে,—নিশ্চয় ফলিল !"

স্বামী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মধ্যে কে রক্ষণীয় সে বিষয়ে দুঃশলার মনে কোন ভ্রান্তি নাই। দুর্যোধন সুনির্দিষ্ট বিনাশপথের যাত্রী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরিণাম সম্বন্ধে ভগ্নীর মনে তাই কোনো উৎকণ্ঠা জাগিতে পারে না। দুঃশলার উৎকণ্ঠা কেবলমাত্র তাঁহার স্বামী জয়দ্রথের জন্য। তাই দুঃশলা স্বামীকে লিখিতেছেন, "তুমি সিন্ধুদেশের অধিপতি, সে সুখের রাজত্ব ছাড়িয়া কি দরকার এই কাল-সমরে যোগ দিয়া?"

"কি কাজ রণে তোমার ! কি দোষে
দোষী তব কাছে, কহ, পঞ্চপাণ্ডু রথী ?
... ...

তবে যদি কুরুরাজে ভালবাস তুমি,
মম হেতু প্রাণনাথ ; দেখ ভাবি মনে,
সমপ্রেমপাত্র তব কুন্তপুত্র বলী।
ভ্রাতা মোর কুরুরাজ ; ভ্রাতা পাণ্ডুপতি !
এক জন জন্যে কেন ত্যজ অন্য জনে,
কুটুম্ব উভয় তব ?"

ন্যায় ও ধর্মের প্রতি দুঃশলার অনুরক্তি আছে বলিয়াই তিনি স্বামীর নিকট এমন অকপট পত্র লিখিয়াছেন। পৌরুষদর্পী স্বৈরশাসক দুর্যোধন হাজার হইলেও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর, ভ্রাতার সকল কুকীর্তি স্বামীর নিকট বর্ণনা করিতে স্বভাবতঃই তাঁহার সঙ্কোচ হইতেছে, তাই তিনি বলিলেন :

"ভ্রাতার সুকীর্ত্তি যত, জ্ঞান না কি তুমি ?
লিখিতে শরমে, নাথ, না সরে লেখনী !"

এখানে 'সুকীর্ত্তি' কথাটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

তাহার পর উৎকণ্ঠিতা দুঃশলা, অর্জুনের বীরত্ব এবং কুরুসেনানায়কদিগের অযোগ্যতার উল্লেখ করিয়া, স্বামীকে বলিতেছেন :

"এ কালাগ্নিকুণ্ডে, কহ, কি সাধে পশিবে ?
কি সাধে ডুবিবে, হায় এ অতল জলে ?"

তাই নারী-হৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুলতা ও আর্তি লেখনীমুখে ঢালিয়া দিয়া দুঃশলা বলিতেছেন :

"এস শীঘ্র, প্রাণসখে, রণভূমি ত্যজি !'

কাপুরুষ বলিয়া যদি কেহ তাঁহার নিন্দা করে, তাহাতে দুঃশলার ক্ষতি নাই, কেন-না কে না জানে যে, 'মহারথী রথীকুলে সিন্ধু-অধিপতি ?' আর, তাহা ছাড়া, যে পার্থ 'দেব-যোনি-জয়ী' তাহার সহিত যুদ্ধে অকারণ স্পর্ধা না দেখাইয়া যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়া কোন 'নর-যোনি'র পক্ষেই অগৌরবের হইতে পারে না।

কিন্তু এত অনুরোধেও যদি স্বামীর মন না গলে, যদি তিনি শ্যালকের প্রতি মমতাবশতঃ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ না করেন, ইহা অনুমান করিয়া দুঃশলা শিশুপুত্রের কথা স্বামীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া লিখিলেন :

"মণিভদ্রে ভুল না নৃমণি !
নিশার শিশির যথা পালয়ে মুকুলে
রসদানে, পিতৃস্নেহ, হায় রে, শৈশবে
শিশুর জীবন, নাথ কহিনু তোমারে।"

দুঃশলা এখনও আশঙ্কা করিতেছেন যে, হয়তো তাঁহার স্বামী ভাবিতে পারেন যে, অর্জুন জয়দ্রথ-নিধনের প্রতিজ্ঞা করিলেও তাঁহার স্বপক্ষে দ্রোণাচার্য সেনাপতি, মহারথী কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও দুর্যোধন থাকিতে, তাঁহার ভয় কি? তাই দুঃশলা পতিগতপ্রাণা কান্তার মত লিখিতেছেন:

"শুন না, নাথ, ও মোহিনী বাণী!
হায়, মরীচিকা আশা ভব-মরুভূমে!
মুদি আঁখি ভাব, দাসী পড়ি পদতলে;
পদতলে মণিভদ্র কাঁদিছে নীরবে।"

দুঃশলার উৎকণ্ঠা এখানে বেদনায় পরিণত হইয়াছে; এমন মর্মভেদী, মর্মান্তিক, অসহায় আবেদন সৃষ্টি করা একমাত্র মধুসূদনের পক্ষেই সম্ভব। মনের গুহার ভিতরে এই আবেদন সহস্র প্রতিধ্বনি তুলিয়া দিয়া সুপ্ত করুণার স্রোতস্বিনীকে জাগাইয়া দেয়। পত্রের উপসংহারে শিল্পী মধুসূদন মাত্র কয়েকটি রেখাপাতে একই সঙ্গে চরিত্র-বিকাশ, অবসর-রচনা, রস-সঞ্চার ও নাটকীয়তার এক অপূর্ব পরিচয় দিয়াছেন! দুঃশলা-চরিত্রচিত্রণের এই শেষ ধাপে আসিয়া কবির যে মনঃসমীক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ভাবুক মাত্রকেই মুগ্ধ করে। স্বামী-মুগ্ধা নারীর অন্তরে স্বামীকে বিপন্মুক্ত পাইবার জন্য যে আকুলি-বিকুলি জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাতে যুক্তিতর্ক, সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত তলাইয়া গেল, আশামুগ্ধা দুঃশলার মানসপটে গড়িয়া উঠিল এক রঙীন নক্সা। এই পাপ-পুরীর বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে স্বামীকে কোনরকমে মুক্ত করিয়া লইয়া দুইজনে শিশুপুত্রসহ একেবারে উধাও হইবেন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে জয়দ্রথ কিভাবে আসিবেন, আসিবার সময় কাহাকে কিছু বলিতে হইবে কিনা, নিশীথে কিভাবে দুঃশলার সহিত জয়দ্রথ মিলিত হইবেন, রাজপুরীর বাহিরে রাত্রি-কালে রাজবালার পক্ষে একাকী অপেক্ষা করা সংগত, না কি, দাসী সঙ্গে থাকা প্রয়োজন—ইত্যাদি প্রশ্নের একেবারে সুন্দর সমাধান প্রেরিত হইল! অবসর-রচনার কোথাও একটু ত্রুটি রহিল না; জয়দ্রথের যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ হইতে একেবারে শিশুপুত্রসহ উভয়ের আপন রাজ্যে গিয়া পৌছান পর্যন্ত ঘটনাগুলি নাটকীয় পট-পরম্পরায় মাত্র পাঁচটি ছত্রে সমুজ্জল হইয়া উঠিল:

"ছদ্মবেশে রাজদ্বারে থাকিবে দাঁড়ায়ে
নিশীথে; থাকিবে সঙ্গে নিপুণিকা সখী,
লয়ে কোলে মণিভদ্রে। এসো ছদ্মবেশে,
না কয়ে কাহারে কিছু! অবিলম্বে যাব
এ পাপ নগর ত্যজি সিন্ধুরাজালয়ে!"

আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, কবি কেমন করিয়া আসন্ন বৈধব্যের ছায়ায় উপস্থাপিত নায়িকাকে আশা-কল্পনায় উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিয়া তাঁহার অন্তরে "কপোত-মিথুন সম' সুখের মিলন-স্বপ্ন মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন! পরদিনই সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহার জীবনের স্বামী-সূর্য চিরতরে অস্ত যাইবে তাঁহাকে দিয়া এই মধু মিলনের স্বপ্ন রচনা করাইয়া কবি করুণ রস-সৃষ্টি কৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

এইভাবে পত্রিকাখানিতে নারীহৃদয়ের উৎকণ্ঠা, স্বামীর অমঙ্গল-আশঙ্কা ও পুনর্মিলনের দুরাশা টাস-বুনানীতে জমিয়া উঠিয়া যেন গভীরতর রসের সঞ্চার করিয়াছে।

জাহ্নবী-পত্রিকা

বীরাঙ্গনা কাব্যে যে এগারোখানি লিপি আছে তাহার মধ্যে আয়তনে ইহাই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম পত্র এবং পাঠকের নিকট ইহার আকর্ষণও অন্যান্য পত্রিকাগুলির তুলনায়, সর্বাপেক্ষা কম। কিন্তু এই পত্রিকার বিচারের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক হওয়া প্রয়োজন। মহাভারত ও পুরাণের সুবিশাল আয়তনের মধ্যে যিনি বিচরণ করিয়াছেন এবং উহা হইতে মাত্র একাদশ সংখ্যক কাহিনীকে আপন কবিকল্পনার পরিচর্যার উপযোগী বলিয়া নির্বাচন করিয়াছেন, তিনি যে কোন্ সাহসে এমন একটি কাহিনীকে পত্র কাব্যের উপযোগী করিতে পারিলেন ইহাই ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হই। নায়িকার যত প্রকার রূপ আমরা অলংকার শাস্ত্রে দেখিতে পাই জাহ্নবী তাহার কোন পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন না। তাঁহার সত্যই এক সৃষ্টিছাড়া রূপ। তিনি অর্ধেক দেবতা, অর্ধেক মানবী। বৈচিত্র্যের অনুরোধে দুঃসাহসী মধুসূদন তাঁহার নায়িকা-আকাশে এক নূতন জ্যোতিষ্ক যোজনা করিয়া বৈচিত্র্যসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। এক কথায় ইহা একটি প্রত্যাখ্যান পত্রিকা। কিন্তু সাধারণ মানবীয় প্রত্যাখ্যানের মধ্যে চাওয়া-পাওয়া মান-অভিমানের যে নানা সুরজাল রচিত হয় এখানে তাহার আশা করিলে চলিবে না। এখানে সম্পর্কটি নিছক মানবীয় নহে, দেব-মানবে মিলনোদ্ভূত; তাও আবার সে মিলন কোন অনুরাগজনিত নহে, নিয়তির চক্রান্তে গঠিত। দেবী জাহ্নবী যে শান্তনুকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছিলেন সে কেবল তাঁহার মাতৃত্বের বহর দেখাইবার জন্য; শাপগ্রস্ত অষ্টবসুর আকুল ক্রন্দনে এই দয়াময়ীর হৃদয় বিগলিত হইল। তাহাদের রক্ষা করিতে হইলে যে নিজের দেবীত্ব বিসর্জন দিতে হয় তাহাতেও এই পতিত-তারিণী বিচলিত হইলেন না। বরদান-কালে আপনার অস্তিত্বের দিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

দিনু বর—'মানবিনী ভাবে ভবতলে
ধরিব এ গর্ভে আমি তোমা সবাকারে!"

যে নারী এই ভাবে আত্মবিসর্জন দিয়া বিপন্নকে উদ্ধার করিতে পারেন তাঁহার মধ্যে মধুসূদন, মনে হয়, খাঁটি বীরাঙ্গনারই পরিচয় পাইয়া থাকিবেন। ইহা ছাড়া পত্রখানিতে আগাগোড়া একটি রোমাণ্টিক সুর ঝঙ্কৃত হইয়া ইহাকে অবশ্যই আবেগমধুর করিয়া তুলিয়াছে।

মহাভারতের একটি সুপরিচিত আখ্যায়িকা এই পত্রিকার বিষয়বস্তু। প্রেমবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য জাহ্নবী শান্তনুর নিকট যে পত্রিকাখানি রচনা করিয়াছেন, কাব্যবিচারে তাহা কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত, ইহা অমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জাহ্নবী দেবী বশিষ্ঠের অভিশাপে শাপভ্রষ্ট অষ্টবসুর অনুরোধে তাঁহাদিগকে গর্ভে ধারণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া মর্ত্যে আগমন করেন এবং হস্তিনার রাজা শান্তনুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের সময় জাহ্নবী দেবী একটি সর্তে রাজাকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কথা ছিল যে, শান্তনু যদি কখনও জাহ্নবীর কোনও কার্যের প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবেন। বিবাহের পর শান্তনুর ঔরসে জাহ্নবীর গর্ভে একে একে আটটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে - যেমন একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, অমনি জাহ্নবী দেবী শিশুপুত্রকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করেন। এই ভাবে শান্তনুর সপ্তমপুত্র গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হইল। মর্মপীড়িত শান্তনু এতদিন কোনও প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু অষ্টম পুত্রের বেলায় রাজা আর থাকিতে পারিলেন না; জাহ্নবী দেবীকে বাধা দিলেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হইল। জাহ্নবী আর থাকিলেন না। শিশুপুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া তিনি শান্তনুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই অষ্টম বসুই মহাভারতের দেবব্রত ভীষ্ম।

জাহ্নবী দেবীর বিরহে শান্তনু বড়ই কাতর হইলেন। শূন্য রাজপুরীতে তিনি থাকিতে পারেন না, উন্মাদের ন্যায় তিনি গঙ্গার তীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। গঙ্গার জলস্রোতে নিজের অশ্রুজল মিশাইয়া জাহ্নবীর উদ্দেশে কথা বলিতেন। এইভাবে বহুকাল কাটিল। দেবব্রত বড় হইয়াছেন। শোকার্ত শান্তনুর নিকট জাহ্নবী বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রকে দিয়া এই লিপিখানি প্রেরণ করেন। পত্রের প্রারম্ভে জাহ্নবী দেবী পূর্বজন্মের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। বিরহী রাজার উদ্দেশে জাহ্নবী অবিক্ষুব্ধ চিত্তেই লিখিতেছেন ঃ

"বৃথা তুমি, নরপতি, ভ্রম মম তীরে,—
বৃথা অশ্রুজল তব, অনর্গল বহি,
মম জলদল সহ মিশে দিবানিশি!"

তাহার পর তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া জাহ্নবী বলিতেছেনঃ

"ভুল ভূতপূর্ব্ব কথা, ভূলে লোক যথা
স্বপ্ন—নিদ্রা-অবসানে ! এ চির-বিচ্ছেদে
এই হে ঔষধ মাত্র, কহিনু তোমারে !—
... ...
"পত্নীভাবে আর তুমি ভেবোনা আমারে।"

এইভাবে শান্তনুকে প্রত্যাখ্যান করিবার পর জাহ্নবী দেবী রাজাকে গৃহে ফিরিয়া গিয়া আবার বিবাহ করিয়া সুখী হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন ঃ

"তরুণ যৌবন তব ; যাও ফিরে দেশে ;—
কাতরা বিরহে তব হস্তিনা নগরী !
যাও ফিরি, নরবর, আন গৃহে বরি
বরাঙ্গী রাজেন্দ্রবালে ; কর রাজ্য সুখে !"

লিপিখানির গাম্ভীর্য, মহত্ত্ব ও পবিত্রতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই প্রত্যাখ্যানের মূলে রূপজ মোহ নাই, কামজ মোহ নাই ইন্দ্রিয়ের উন্মাদনা নাই। মর্ত্যের মানুষ শাপভ্রষ্টা দেবকন্যাকে সর্তাধীনে বিবাহ করিয়াছিলেন। সর্ত ভঙ্গ হইল ; সঙ্গে সঙ্গে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিয়া দেবকন্যা ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু শান্তনুর হৃদয় জাহ্নবীর প্রেমে পরিপূর্ণ, জাহ্নবী যে তাহা জানিতেন না, বা বুঝিতেন না, তাহা নহে। উদাসীন শান্তনুর জন্য নারীহৃদয়ে যে কিছুমাত্র বেদনা জাগিত না তাহা নহে, বরং জাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রেম-নিবেদনের আকুতি প্রকাশ করিবার কোন অবকাশ নাই অথচ জাহ্নবীর অন্তর স্বামীর জন্য সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ। এই অবস্থায় ঠিক যেভাবে পত্রলেখা সংগত, যে রকম গাম্ভীর্য ও মহত্ত্বপূর্ণ ইহার ভাষা হওয়া উচিত, কবি জাহ্নবীর লেখনীমুখে তাহাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই sublimity-ই পত্রিকার একমাত্র সৌন্দর্য।

উদাসীন রাজাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য জাহ্নবী দেবী তাঁহাদের অষ্টমপুত্র দেবব্রতকে শান্তনুর নিকট ফিরাইয়া দিয়া লিখিতেছেন ঃ

"অষ্টম নন্দনে আজি পাঠাই নিকটে।"

পুত্রকে শান্তনুর নিকট পাঠাইয়া জাহ্নবী তাঁহার স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। ইহা তাঁহার কৃতজ্ঞতার নিদর্শনও বটে। যতদিন তিনি রাজার আলয়ে ছিলেন ততদিন রাজার ভালবাসায় তিনি যে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, তাহারই অভিজ্ঞানরূপে তিনি পুত্ররত্নকে শান্তনুর নিকট পাঠাইতেছেন।

প্রেমের এই যে মহত্বপূর্ণ প্রকাশ—জাহ্নবী-চরিত্রকে ইহা অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে ঃ

"যতদিন ছিনু তব গৃহে,
পাইনু পরম প্রীতি ! কৃতজ্ঞতা পাশে
বেঁধেছ আমারে তুমি ; অভিজ্ঞানরূপে
দিতেছি এ রত্ন আমি, গ্রহ, শান্তমতি ।"

তাহার পর জাহ্নবী দেবী স্বামীকে তাঁহার অন্তরের- অভিলাষ নিবেদন করিয়া বলিতেছেন ঃ

"বরিও এ পুত্রবরে যুবরাজ-পদে
কালে। মহাযশা পুত্র হবে তব সম,
যশস্বি ।"

জাহ্নবীর মনের ইচ্ছা এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে ; পত্নীবিরহে বিধুর রাজা আবার রাজধানীতে ফিরিয়া যান, তিনি আবার বিবাহ করুন ; প্রজাপালন করুন, শত্রু দমন করুন, সৎকর্ম্ম করুন—অতীত জীবন বিস্মৃত হইয়া শান্তনু আবার নূতন করিয়া সংসার রচনা করুন,—ইহাতেই সাধ্বী জাহ্নবী পরিতৃপ্ত হইবেন ঃ

"অন্তরীক্ষে থাকি
তব পুরে, তব সুখে হইব হে সুখী
তনয়ের বিধুমুখ হেরি দিবানিশি !"

এইভাবে মহৎ প্রেমের অভিব্যক্তিতে পত্রিকাখানি আগাগোড়া সুন্দর।

উর্বশী পত্রিকা

বীরাঙ্গনা কাব্যে যে চারিখানি প্রেমপত্রিকা আছে, এই উর্বশী-পত্রিকা তাহার অন্যতম। প্রেমাস্পদের নিকট প্রণয়-নিবেদন এই লিপির মূল সুর।

উর্বশী স্বর্গের অপ্সরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। একদিন উর্বশী সখী চিত্রলেখাকে সঙ্গে লইয়া কুবের-ভবন হইতে ফিরিতেছিলেন। পথিমধ্যে হিরণ্যপুরবাসী কেশী নামক দৈত্য তাঁহাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যায়। ঠিক সেই সময় রাজা পুরুরবা সূর্যমণ্ডল হইতে ফিরিতেছিলেন ; আকাশপথে তিনি অন্যান্য অপ্সরাগণের মুখে উর্বশী-হরণের কাহিনী শুনিতে পাইলেন। ভীম পরাক্রমে দৈত্যকে তিনি আক্রমণ করিয়া সখীসহ উর্বশীকে উদ্ধার করেন। মূর্ছান্তে উর্বশী রাজা পুরুরবার রূপ-দর্শনে মনে মনে তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইলেন।

এই ঘটনার পর একদিন রাত্রিকালে স্বর্গলোকে ইন্দ্রসভায় দেবগণের সমক্ষে একটি নাটকের অভিনয়ে উর্বশীকে অংশগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। অভিনয়কালে উর্বশীর মুখে অকস্মাৎ ভুলক্রমে পুরুরবার নাম উচ্চারিত হয়। স্বর্গের অপ্সরীর মুখে মর্ত্যের রাজার নাম উচ্চারণের ফল যাহা হইবার তাহাই হইল; ভরত-ঋষির শাপে উর্বশী তখনই স্বর্গভ্রষ্টা হইলেন। প্রেমাস্পদের নিকট লিপি রচনা করিয়া পাঠাইবার পক্ষে এই পরিস্থিতি যে যথেষ্ট নাটকীয় উপাদানে পূর্ণ, তাহা বলা বাহুল্য। পুরাণের এই কাহিনী কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের উপাদান যোগাইয়াছিল। সম্ভবত, কালিদাসের নাটকের সেই আখ্যায়িকা মধুসূদনকেও তাঁহার বীরাঙ্গনা কাব্যের উর্বশী-পত্রিকার সূত্র ধরাইয়া দিয়াছে।

স্বর্গচ্যুতা হইবার পর নন্দনের মন্দাকিনীতীরে বসিয়া উর্বশী এই লিপি রচনা করেন এবং সখী চিত্রলেখাকে দিয়া ইহা পুরুরবার নিকট প্রেরণ করেন। পত্রের আরম্ভেই উর্বশী স্বর্গচ্যুতির কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন এবং সরল মনেই বলিয়াছেন যে, পুরুরবার প্রতি অনুরক্তির ফলেই অভিনয়কালে তাঁহার আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছিল ঃ—

"শুন নরকুলনাথ! কহিনু যে কথা
মুক্তকণ্ঠে কালি আমি দেবসভাতলে,
কহিব সে কথা আজি—কি কাজ শরমে?
কহিব সে কথা আজি তব পদযুগে!

অকপটে প্রেমের এই স্বীকৃতি বড়ই সুন্দর! উর্বশী তাঁহার সমস্ত লজ্জা-সংকোচ ত্যাগ করিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, পুরুরবার প্রতি তিনি দুর্বার আকর্ষণ বোধ করেন এবং সাগরগামিনী নদীর মতই তাঁহার প্রেম ঃ

"যথা বহে প্রবাহিনী বেগে সিন্ধুনীরে
অবিরাম; যথা চাহে রবিচ্ছবি পানে
স্থির আঁখি সূর্যমুখী!"

স্বর্গভ্রষ্টা হইয়াছেন বলিয়া উর্বশীর কোন ক্ষোভ নাই। পুরুরবার প্রেমের নিকট স্বর্গের সুখভোগ তুচ্ছ এবং তিনি পুরুরবার প্রেম লাভ করিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবেন ঃ

"দেহ আজ্ঞা, নরেশ্বর, সুরপুর ছাড়ি
পড়ি ও রাজীব পদে।"

এই আত্মনিবেদনের মধ্যেই উর্বশীর প্রেম চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে।

তাহার পর উর্বশী রাজা কর্তৃক দৈত্যহস্ত হইতে তাঁহার উদ্ধার এবং জ্ঞানলাভের পর তাঁহার সম্বন্ধে পুরুরবা যে সব কথা বলিয়াছিলেন, সেইসব কথার উল্লেখপূর্বক রাজার প্রতি তাঁহার অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কি, উর্বশীর রূপে বিমুগ্ধ পুরুরবা মধুচ্ছন্দে তাঁহার উদ্দেশে যে-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, উর্বশী তাহাও বিস্মৃত হয় নাই :

"আর যা কহিলে
এখনো পড়িলে মনে বাথানি, নৃমণি,
রসিকতা।"

উর্বশীর স্মৃতিপটে পুরুরবার চিত্র চিরদিনের মত অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। পুরুরবা শুধু প্রিয়দর্শন এবং রসিক পুরুষই নহেন, তিনি বীর, তাই তো তিনি 'দেবী-মানবীর বাঞ্ছা।' 'উর্বশীর এই প্রেম-মাল্য রূপজ মোহে ঝলমল করিলেও পৌরুষের প্রতি নারীহৃদয়ের যে একটি বিমুগ্ধতা আছে তাহা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। পৌরুষের প্রতি এই আকর্ষণ ও স্বপ্নমুগ্ধতাই স্বর্গের অপ্সরীকে মর্ত্যের মানবের প্রেমবশীভূতা করিয়াছে!' এবং সেইজন্যই তো উর্বশী পুরুরবার চরণে তাঁহার দেহমন বিকাইতে অধীর আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যদি রাজা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন তবে উর্বশী সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত আছেন :

"যদি ঘৃণা কর, দেব, কহ শীঘ্র, শুনি !
অমরা অপ্সরা আমি, নারিব ত্যজিতে
কলেবর ; ঘোর বনে পশি আরম্ভিব
তপঃ তপস্বিনী বেশে দিয়া জলাঞ্জলি
সংসারের সুখে, শূর !"

হয়ত কোন কোন পাঠকের নিকট এই পত্রিকা রূপজ প্রেমের স্তুতিমাত্র বলিয়া অশ্রদ্ধার বস্তু হইতে পারে। কিন্তু রোমান্টিক প্রেমের বিচারে কোন রক্ষণশীল মনোভাব বিচারককে খাঁটি পথ দেখাইতে পারে না। একটু তলাইয়া দেখিলে জগতের অধিকাংশ বিশুদ্ধ ও গভীর প্রেমই রূপ-সম্ভূত। সেক্সপীয়র বলিয়াছেন, প্রথম দর্শনের প্রেমই—Love at first sight—সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং এই প্রথম দর্শনে রূপেরই আধিপত্য। শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের প্রেমও কি এই রূপ হইতেই জাগে নাই? তবে বিচার্য হইল প্রেমের গভীরতা কিন্তু যেখানে স্বর্গের শ্রেষ্ঠ রূপসী প্রেমের বশবর্তিনী হইয়া তপস্বিনী সাজিতে দৃঢ়সংকল্প, সেখানে অগভীরতার আশঙ্কা করার

কোন যুক্তি নাই। তাহা ছাড়া সুর-সুন্দরী হইয়াও উর্বশী যে মানবী হইতে আদৌ বিসদৃশ নহে ইহা বুঝাইবার জন্য তাহার কি ঐকান্তিক প্রয়াস ঃ

"রূপগুণাধীনা
নারীকুল, নরশ্রেষ্ঠ, কি ভবে, কি দিবে—
বিধির বিধান এই, কহিনু তোমারে।"

উর্বশীর প্রেম সত্যই আন্তরিকতায় ভরপুর—রোমান্টিক প্রেমের চমৎকার আদর্শ।

জনা-পত্রিকা

বীরাঙ্গনা কাব্যে যে দুইখানি অনুযোগপত্র আছে তাহার মধ্যে ইহা দ্বিতীয়। স্বামীর ব্যবহারে পীড়িতা নারীর মর্মজ্বালা ও আত্মমর্যাদা এই পত্রিকার মূল সুর। কেকয়ী পত্রিকার ন্যায় জনা-পত্রিকাও বীরাঙ্গনা কাব্যের দ্বিতীয় উৎকৃষ্ট পত্র। দুঃখ, ব্যঙ্গ, তিরস্কার সম্মিলিত হইয়া কেকয়ী-পত্রিকার ন্যায় এই পত্রিকাখানিও পরম উপভোগ্য হইয়াছে, তবে জনা-পত্রিকায় বীরত্বের ব্যঞ্জনা সমধিক পরিস্ফুট। ইহার ছত্রে ছত্রে মর্মপীড়িতা নারীহৃদয়ের জ্বালা ও অভিমান ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুত্রের মৃত্যুতে জনার বিলাপ সাধারণ পুত্রশোকাতুরা নারীর বিলাপ নহে। ইহা তেজস্বিনী নারীর অগ্নিগর্ভ বিলাপ। এই বিলাপে অশ্রু নাই—আছে শুধু অগ্নিময়ী জ্বালা। কাব্যোৎকর্ষের বিচারে এই পত্রিকাখানি তাই সর্বাঙ্গসুন্দর এবং ইহার আবেদন মর্মভেদী। বলিতে গেলে, বীরাঙ্গনা কাব্যের একমাত্র বীরাঙ্গনা এই জনা। পুত্রশোকাতুরা নারীর এমনি তেজস্বিনী মূর্তি একমাত্র মধুসূদনের কল্পনাতেই সম্ভব—যে কল্পনার বিস্ময়কর সৃষ্টি মেঘনাদবধের নায়িকা প্রমীলা।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন। যজ্ঞের অশ্বের সহিত অর্জুন দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। নানা দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়া তিনি মাহেশ্বরী পুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাহেশ্বরীর রাজা নীলধ্বজ। তাঁহার একমাত্র পুত্র প্রবীর। প্রবীর যজ্ঞাশ্ব ধরিলে অর্জুন মাহেশ্বরী পুরী আক্রমণ করিলেন। অর্জুনকে বাধা দিতে গিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবীর নিহত হইলেন। পুত্রের মৃত্যুতে নীলধ্বজ কোথায় প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীরের ন্যায় অর্জুনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন, না, নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় পুত্রহন্তা শত্রুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শুধু তাহাই নহে, উপরন্তু অর্জুনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাঁহার সহিত হস্তিনাপুরে যাইতে স্বীকৃত হইলেন।

জনা-পত্রিকার পটভূমিকা ইহাই। স্বামীর এই কাপুরুষতায় নীলধ্বজের মহিষী জনা, প্রকৃত ক্ষত্রিয় নারীর ন্যায়, ব্যথিতা ও ক্রুদ্ধা হইয়া স্বামীর নিকট এই পত্রিকাখানি লিখিয়াছেন। পত্র লিখিবার পক্ষে এই অবসর নাটকীয় উপাদানে পূর্ণ বলিয়া মধুসূদনের নাটকীয় প্রতিভা এখানে পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত হইয়াছে, এবং কবি অবলীলাক্রমে সমগ্র লিপিখানিকে একটি সার্থক পরিণতিতে লইয়া গিয়াছেন। মধুসূদনের জনা তাঁহার প্রমীলা-চরিত্রের মতই বাংলা সাহিত্যে এক অপূর্ব সৃষ্টি। ক্ষাত্রতেজের জীবন্ত প্রতিমা জনা। তিনি শুধু বীরাঙ্গনা নহেন, বীরের জননীও। একমাত্র প্রিয়পুত্রকে তিনি স্বহস্তে বীরের সাজে সজ্জিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়াছিলেন। সেই পুত্র যুদ্ধে বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করিল; কিন্তু পুত্রশোক অপেক্ষা স্বামীর বিসদৃশ আচরণই জনাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। সেই ব্যথার ভিতর দিয়াই বীরাঙ্গনার প্রতিশোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাসাদে উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। জনা ইহার কারণ সবই জানেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার ভ্রান্ত স্বামীকে লজ্জায় ও কুণ্ঠায় ফেলিয়া তাঁহার জ্ঞানোদয় ঘটাইবার জন্য লিখিলেন, তাঁহার স্বামী বোধ হয় নূতন করিয়া পুত্রহন্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন! এবং সেই প্রশ্ন লইয়াই তাঁহার পত্রখানি আরম্ভ:

"সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে—
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে ?
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
মহাবাহু!"

ক্ষত্রিয় স্বামীর সম্পর্কে এইরূপ অনুমান ক্ষত্রিয় নারীর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক হইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি যেভাবে পতির অন্তরে ক্ষাত্রতেজ উদ্দীপ্ত করিয়া প্রতিহিংসানল জ্বালাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, ভাবে ও ভাষায় তাহার ব্যঞ্জনাও অপূর্ব:

"যাও বেগে গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি' নিনাদে!
টুট কিরীটীর গর্ব্ব আজি রণস্থলে!
খণ্ডমুণ্ড তার আন শূল-দণ্ড-শিরে!
অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে;
নাশ, মহেষাস, তারে!"

বীরপুত্র সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে, তাহার জন্য বিলাপ করিতে নাই, বীরনারী জনার একথা জানা আছে বলিয়াই তিনি স্বামীকে লিখিতে পারিয়াছেন:

"কি কাজ বিলাপে, প্রভু? পাল, মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম্ম, ক্ষত্রকর্ম্ম সাধ ভুজবলে।"

কিন্তু এতক্ষণ যে আশায় জনার মন উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, সখীমুখে রাজসভার বিবরণ শুনিয়া তাঁহার সে ভুল ভাঙিয়া গেল—তিনি অত্যন্ত নিরাশ হইলেন। পুত্রহন্তা অর্জুনকে স্বামী রাজসিংহাসনের পার্শ্বে বসাইয়াছেন জানিতে পারিয়া জনার বিস্ময়ের সীমাপরিসীমা রহিল না। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে, রাজসভায় নৃত্যগীতের যে উৎসব চলিতেছে তাহা পার্থের মনোরঞ্জনের জন্যই এবং তাঁহার স্বামী, মাহিষ্মতী পুরীর অধীশ্বর নীলধ্বজ, নিজে অর্জুনের পদসেবা করিতে ব্যস্ত—তখন জনার বিস্ময় ঘৃণায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। ক্ষোভে, লজ্জায়, ঘৃণায় বীরনারীর হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। তাঁহার ক্ষাত্রতেজ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ফাটিয়া পড়িল। আহতা সর্পিণীর ন্যায় জনা লিখিলেন :

'তব সিংহাসনে
বসিছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে!
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে।—
কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায়, কব কারে?
... ...
কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এই কি, নৃমণি?'

কিন্তু জনার মনে হইল এই গঞ্জনা, এই তিরস্কার সবই হয়ত বৃথা হইবে। এই রকম জ্বালাময়ী বাণী শুনিবার পরও নীলধ্বজের অন্তরে হয়ত কোন পরিবর্তনই দেখা যাইবে না—পুত্রশোকাতুর রাজার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ক্ষাত্রতেজ উদ্দীপিত হইবে না। তখন শোকার্তা বীরাঙ্গনার লেখনী সহসা যেন বিষ উদ্গীরণ করিল,—ক্ষোভে, রোষে তিনি অর্জুনের অন্যায় যুদ্ধ এবং চরিত্রের দুর্বলতার কথা পতিকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেও যদি কোনও ফল না হয়, যদি নীলধ্বজ বিন্দুমাত্র বিচলিত না হন, কিংবা প্রতিহিংসা লইতে সম্মত না হন, এইরূপ অনুমান করিয়াই জনার মনের পুঞ্জীভূত ক্রোধ যেন ফাটিয়া পড়িল। তিনি লেখনীমুখে একে একে কুন্তীর, দ্রৌপদীর, এমন কি মহাভারত-প্রণেতা ব্যাসদেবের পর্যন্ত কুৎসা-কীর্তন করিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ-সভায় ক্রুদ্ধ শিশুপাল যেমন কৃষ্ণ-চরিত্রের প্রতিকূল ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এখানে পুত্রশোকে উন্মাদিনী জনার উক্তিও সেই রকম। এই নির্বিচার কটূক্তির মূলে দুইটি জিনিস কার্যকরী ছিল; প্রথম, প্রবীরের

মৃত্যু এবং দ্বিতীয়, নীলধ্বজের উদাসীনতা। অর্জুনের সম্মুখেই এই সব জ্বালাময়ী কটূক্তি বর্ষিত হইল। নর-নারায়ণ অর্জুনকে তিনি জারজ বলিলেন, কুন্তী ও পাঞ্চালীকে ভ্রষ্টা রমণী বলিয়া নিন্দা করিলেন। তাঁহার পতির পার্শ্বে তাঁহারই পুত্রহন্তা সম্মানিত অতিথিরূপে পূজিত—জনার নিকট এই অপমান অসহ্য বোধ হইল।

তখন মৃতপুত্রের উদ্দেশে মাতৃজনোচিত হৃদয়-বিদারী শোকোচ্ছ্বাসের পর অবশেষে জনা লিখিলেন :

> "যাও চলি মহাবল, যাও কুরুপুরে
> নব মিত্র পার্থ সহ ! মহাযাত্রা করি'
> চলিল অভাগী জনা পুত্রের উদ্দেশে !
> ... ... যাচি চিরবিদায় ও পদে !"

এইভাবে জনার নারীসুলভ কোমল হৃদয়বৃত্তির সহিত অপূর্ব সুষমামণ্ডিত তেজস্বিতার সংমিশ্রণ করিয়া কবি এক অনিন্দ্যসুন্দর বীরাঙ্গনা-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পত্রিকার প্রতিটি ছত্রে তেজস্বিতা ও তিরস্কার একসঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

জনার আত্মমর্যাদাজ্ঞান অত্যন্ত প্রখর বলিয়া তিনি পুত্রশোকে যতটা না কাতর হইয়াছেন, তাহার চেয়ে বেশী মনস্তাপ পাইয়াছেন স্বামীর আচরণে; পরিশেষে জনা তাই লিখিতেছেন :

> "ক্ষত্র-কুলবালা আমি ; ক্ষত্র-কুল-বধূ ;
> কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য্য ধরি' ?
> ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে ;
> দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্তনগরে
> লভি অন্তে !"

হস্তিনাপুরের আমোদ শেষ করিয়া নীলধ্বজ যখন ফিরিয়া আসিবেন, তখন দেখিবেন রাজপুরী শূন্য।

> "ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি'
> নরেশ্বর, "কোথা জনা ?" বলি ডাক যদি,
> উত্তরিবে প্রতিধ্বনি—,কোথা জনা ?" বলি !

এই পরিসমাপ্তির অব্যবহিত পূর্বেই জনা স্বামীর চরণে চির-বিদায় যাচ্ঞা করিয়াছেন। জনা-পত্রিকার এই শেষ চারি-ছত্রের কবি-নৈপুণ্যের তুলনা নাই। জনার একটি উচ্চাঙ্গের বীরাঙ্গনা-রূপ পত্রিকার নাতিহ্রস্ব দেহে গাঢ় উজ্জ্বলবর্ণে

অঙ্কিত হইলেও, তাঁহার নারী-রূপ যেন সম্যক্ বিকশিত হয় নাই। কিন্তু পত্রিকার এই শেষ চারি ছত্রের চমৎকার নাটকীয় উপসংহারে চরিত্র-সৃষ্টির ঐ অঙ্কনটিও রূপে রেখায় অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। এখানে আসিয়া আমরা যেন কিছুতেই ভুলিতে পারি না যে, জনাও ভারতীয় নারী। স্বামীর চরণে বিদায় প্রার্থনা না করিলে তাঁহার মরণেও সুখ নাই। আর তিনি অভিমানবশে প্রাণ বিসর্জনের জন্য রাজপুরী ত্যাগ করিতেছেন বটে, কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি, স্বামীর প্রতি দরদবশতঃ তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে চায়। শূন্য ঘরে 'কোথা জনা' বলিয়া ডাকিয়া রাজা যখন কেবল প্রতিধ্বনিই শুনিতে পাইবেন, স্বামীর তখনকার সেই মর্মবেদনা অনুমান করিয়া স্বামীপ্রাণা এই নারী যে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছেন না,—এইখানেই জনার এক সকরুণ নারীরূপ পাঠকের মানসপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

৫। প্রশ্নোত্তর

১। বীরাঙ্গনা কাব্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিষয়ানুগ সমালোচনা করিয়া দেখাও যে, লিরিকের সৌন্দর্য এবং বীররসের গাম্ভীর্যের সংমিশ্রণে উহা কাব্যোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

উত্তর ঃ বীরাঙ্গনা কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝিয়া ইহার সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিলে (বীরের অঙ্গনা বা বীরাঅঙ্গনা), এই কাব্যের কোন কোন পত্রিকার মধ্যে অসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু বীরাঙ্গনার অর্থ কবি মধুসূদন নিজে যাহা দিয়াছেন, তাহা মানিয়া লইলে, আর কোন অসুবিধা থাকে না। "বীরাঙ্গনা" i.e. Heroic Epistles from the most noted Pauranic women to their lovers or lords", অর্থাৎ কয়েকজন প্রসিদ্ধ পৌরাণিক নায়িকা তাঁহাদের স্বামী অথবা প্রেমাস্পদের নিকট পত্র লিখিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ রোমক কবি ওবিদের Heroic Epistles নামক পত্রিকা-কাব্য পড়িয়া মধুসূদন বাংলা ভাষায় ঐরূপ সাহিত্য রচনা করিতে মনস্থ করেন। তাহারই ফল 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। ওবিদের বইখানি পাশ্চাত্ত্য পুরাণে সুপরিচিত নায়িকাগণ কর্তৃক তাহাদের পতি বা প্রণয়ীদের প্রতি লিখিত পত্রিকা-কাব্য। ইহাতে একুশখানি পত্রিকা আছে। মধুসূদনের ইচ্ছা ছিল। একুশখানি পত্রিকায় তাঁহার কাব্য শেষ করিবেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহা হইয়া উঠে নাই। মাত্র এগারখানি পত্রিকা তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন। কবি সম্ভবতঃ প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য হইতেও ইহার প্রেরণা পাইয়া থাকিবেন; কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে শকুন্তলা কর্তৃক পত্রলেখার উল্লেখ আছে; ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের নিকট রুক্মিণীর পত্র লিখিবার কথা আছে, এইভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের নানাস্থানে নারীজন কর্তৃক প্রণয়পাত্রকে পত্র পাঠাইবার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা মধুসূদনের জানা থাকিবার কথা। তবে সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ পত্রের উল্লেখ থাকিলেও, কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এমন পত্রিকা নাই বলিলেই হয়। তাই, ওবিদের পত্রিকাগুলির আদর্শেই মধুসূদন আমাদের পুরাণের এগারটি প্রসিদ্ধ নারী-চরিত্র নির্বাচন করিয়া, যাঁহার উপাখ্যানের যে অংশে পত্রলিখন-কাব্যাংশে শোভন ও সঙ্গত, কবি সেই অংশটুকু লইয়া বীরাঙ্গনা কাব্যের পত্রগুলি রচনা করিয়াছেন।

গীতিকাব্যের প্রতি মধুসূদনের একটা আকর্ষণ ছিল। তাঁহার কবিমানসে রোমাণ্টিক কাব্যদর্শনও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। লিরিকের প্রতি কবির যে একটা প্রবল আসক্তি ছিল, তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য'ও তাহার সাক্ষ্য দেয়। ইহার অনেক স্থলেই লিরিকের উচ্ছ্বাস পরিদৃষ্ট হয়। মেঘনাদবধ কাব্যের পরে তিনি আর

বীররসাত্মক কাব্য রচনা করিবেন না বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মূলে ছিল প্রধানতঃ এই সঙ্কল্প এবং বন্ধু ভূদেবের অনুরোধ।

বীরাঙ্গনা বীররসের আবরণে লিরিক কাব্য। ভাষার লালিত্যে ও ছন্দের পারিপাট্যে ইহা নিঃসন্দেহে মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ রচনা। তিলোত্তমাসম্ভব এবং মেঘনাদবধ কাব্যে কবি যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছেন, আমরা দেখিতে পাই সেই ছন্দ বীরাঙ্গনা কাব্যে আসিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ইহার প্রবাহ পূর্বাপেক্ষা স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল ; ইহার সর্বত্রই একটি সঙ্গীতধ্বনি ঝঙ্কৃত হইয়া কাব্যখানিকে পরম উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে। কবিত্বশক্তির দিক্ দিয়া বিচার করিলে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' উৎকৃষ্ট, কিন্তু কাব্যোৎকর্ষের বিচারে 'বীরাঙ্গনা' তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা ; ভাষার লালিত্য এবং ছন্দের পারিপাট্য এই কাব্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

বীরাঙ্গনা কাব্যখানিতে একাধিক নায়িকা এক শ্রেণীর পত্র রচনা করিলেও কোনো দুইখানি পত্র এক রকম হয় নাই। সমজাতীয়া চরিত্রের মধ্যেও ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া মধুসূদন কৃতিত্ব ও কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এই কাব্যের মধ্য দিয়াই বাংলা সাহিত্যে প্রথম রোমান্টিক প্রেমের আদর্শ প্রবেশ করিয়াছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দের আধারেও যে লিরিকের মিষ্টতা ও সৌন্দর্য সম্ভব, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় বীরাঙ্গনা কাব্য। যে-ছন্দে তিনি যুগান্তকারী এপিক রচনা করিলেন, ঠিক সেই ছন্দেরই সাহায্যে লিরিকভাব অভিব্যক্ত হইল বীরাঙ্গনায়। সত্যই এই ছন্দ মহাকাব্য-রচনার পক্ষে উপযোগী। ইহার সাহায্যে আখ্যানভাগ বিবৃত করা যায়, লিরিকের সুকোমল ভাবও প্রকাশ করা যায় ; ইহার সাহায্যে বহিঃপ্রকৃতির রূপবর্ণনা যেমন সম্ভব, তেমনি মানবপ্রকৃতির আন্তর রাজ্যের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও সম্ভব। এই ছন্দে সবরকম ভাবই ফুটাইতে পারা যায়—কমেডি হইতে ট্রাজেডি পর্যন্ত যত রসবৈচিত্র্য আছে তাহার সবই এই ছন্দের সাহায্যে রূপায়িত করা যাইতে পারে।

ইহার যথার্থতা মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। মেঘনাদবধের মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য আমাদিগকে যেমন বিস্মিত করিয়াছে, 'বীরাঙ্গনা'র ছন্দের অপূর্ব বর্ণবিন্যাস তেমনই আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। গাম্ভীর্য ও কোমলতার আশ্চর্য সংমিশ্রণে এই কাব্যের একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। শকুন্তলা প্রভৃতির করুণ-কোমলতা এবং জনা-দ্রৌপদীর তেজস্বিতা ও তিরস্কার এই পত্র-কাব্যে একাধারে সম্মিলিত হইয়াছে এবং এই বিচিত্রতাই এই কাব্যের সম্পদ্। বাংলা সাহিত্যে ইহা যেমন মধুসূদনের নূতন সৃষ্টি, তেমনই এই বীরাঙ্গনা কাব্যেই তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

যে লিরিক ঝঙ্কার বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাহা যে কেবল তারা, স্থূর্পণখা, উর্বশী এবং রুক্মিণী এই চারিখানি বিশুদ্ধ প্রেমপত্রিকাতেই বর্তমান, তাহা নহে, প্রকৃতপক্ষে এখানকার মোট এগারখানি পত্রিকার একটিও লিরিক সুর-বর্জিত নহে। যেখানেই প্রাণের কথা সোজাসুজি অপর প্রাণে পৌছাইয়া দিবার ব্যাকুল আগ্রহ দেখা দেয়, সেখানেই হয় লিরিকের উপযুক্ত অবসর; এবং এই ব্যাকুলতাই বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রত্যেকটি পত্রিকার মূল উৎস। লিরিকের যাদুকর মধুসূদন তাঁহার প্রতিটি নায়িকার লেখনীমুখে এই ব্যাকুলতাকে যে সত্যই এক সঙ্গীত-মুখর অভিব্যক্তি দান করিয়াছেন, তাহা সংবেদনশীল পাঠকমাত্রেই বুঝিবেন। এই লিরিক যে কেবল প্রেম-নিবেদন বা প্রিয়ের জন্য উৎকণ্ঠাতেই ফুটিয়াছে তাহা নহে, প্রত্যাখ্যান ও অনুযোগের মধ্যেও ইহার অসদ্ভাব নাই। জনার ন্যায় কঠোরভাষিণীও পত্রিকার শেষ চারি ছত্রে যেভাবে মানসিক আর্তি প্রকাশ করিয়াছেন, স্বামীর প্রতি সমবেদনায় যেভাবে তাঁহার নারীহৃদয় এখানে একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কে বলিবে জনা-পত্রিকায় লিরিক-সুর একেবারে ধ্বনিত হয় নাই?

আবার এই জনা, কেকয়ী ও জাহ্নবী-পত্রিকায় কতই না বীরত্ব, সংযম ও গাম্ভীর্য-পূর্ণ উক্তি খাঁটি বীররসের সঞ্চার ঘটাইয়াছে। অথচ লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই লিরিকের সৌন্দর্য ও বীররসের গাম্ভীর্য কোন পত্রিকাতেই রসাভাস ঘটায় নাই। দক্ষ শিল্পীর নিপুণ তুলিকায় প্রত্যেকটি চরিত্র স্বকীয় ভাবানুযায়ী উক্তি ও আচরণের মধ্যে একেবারে জীবন্ত ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। বীররস ও করুণরস আপাতবিরোধী হইলেও মধুসূদন উভয়ের মধ্যে এক বিস্ময়কর সমন্বয় ঘটাইয়া 'বীরাঙ্গনা'কে এক অপূর্ব কাব্যোৎকর্ষ দান করিয়াছেন।

২। বীরাঙ্গনা কাব্যের অন্তর্গত পত্রিকাগুলির শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনাপূর্বক দেখাও যে, পত্রাকারে কাব্য রচনা করা সম্ভব।

উত্তর ঃ বীরাঙ্গনা কাব্যে সর্বসমেত এগারখানি পত্র আছে। তাহার মধ্যে কেকয়ী, জনা ও জাহ্নবীর পত্রিকা ভিন্ন বাকী সবগুলিই প্রণয়-পত্রিকা। বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রেম-পত্রিকা ও বীররসাত্মক পত্রিকাগুলির মধ্যে আবার চারিটি শ্রেণী-বিভাগ রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, প্রেম পত্রের মধ্যে তারা, স্থূর্পণখা, উর্বশী ও রুক্মিণীর পত্রগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল প্রেমিকা নিজ নিজ প্রেমাস্পদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া পত্র রচনা করিয়াছেন। এই চারিজনের মধ্যে প্রেমিকা তারা সধবা, স্থূর্পণখা বিধবা, উর্বশী বারবণিতা এবং রুক্মিণী কুমারী।

কবি এই চারিজনকে নারীজীবনের চারিটি সম্ভাব্য অবস্থার প্রতিনিধি হিসাবেই কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু অত্যন্ত নিপুণতার সহিত কবি এই চারিজনের প্রত্যেকেরই পত্রে চরিত্র ও প্রেম-নিবেদনের বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এবং তাহাদের অন্তর-রহস্য বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেকের প্রেমপূর্ণ জগৎ আমাদের নিকট খুলিয়া মেলিয়া ধরিয়াছেন।

দ্বিতীয়, প্রত্যাখ্যান-পত্র। প্রেমবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য জাহ্নবী শান্তনুর নিকট যে-পত্র লিখিয়াছেন, তাহা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তৃতীয়, স্মরণার্থ পত্রিকা: শকুন্তলা, দ্রৌপদী, ভানুমতী ও দুঃশলার পত্র চারিখানি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এগুলি স্বামীর অদর্শনে ব্যাকুলা বা স্বামীর অমঙ্গল-চিন্তায় প্রোষিতভর্তৃকার পত্র। চতুর্থ, অনুযোগ-পত্র: কেকয়ী ও জনার পত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই দুইখানি পত্রই স্বামীর ব্যবহারে পীড়িতা মুখরা নারীর পত্র।

"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং"—ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের এই প্রচলিত সংজ্ঞানুসারে যদি আমরা বিচার করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, বীরাঙ্গনার প্রত্যেকটি পত্রই রসোত্তীর্ণ হইয়া কাব্যের পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। শব্দালঙ্কার ও অর্থলঙ্কারেও ইহা কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। রস যাহার আত্মা, এমন বাক্যই কাব্য। শব্দ ও অর্থ যে কাব্যপুরুষের শরীর, উপমাদি যাহার অলঙ্কার, মাধুর্যাদি যাহার গুণ, ধ্বনি যাহার জীবন, রস সেই কাব্যপুরুষের আত্মা অর্থাৎ মূলীভূত সার-স্বরূপ। রস বলিতে আমরা সাধারণতঃ 'emotion'কে বুঝিয়া থাকি এবং পাশ্চাত্ত্য দেশেও এখন স্বীকৃত হইয়াছে যে, এই 'emotion' অর্থাৎ রসই কাব্যের মূলীভূত সারবস্তু। আবার কাব্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের মূলও এই 'emotion' বা রস: "all beauty is the expression of what may be generally called emotion," এবং এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বীরাঙ্গনা কাব্যের পত্রিকাগুলির মধ্যে সকল রসই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তবে তাহার মধ্যে বীর, করুণ, ও শৃঙ্গার রসেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

বীরাঙ্গনার কাব্যমাধুর্য কাব্যরসিক মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। জনা-পত্রিকাখানির বীররস আস্বাদন করিতে কষ্ট হয় না। বীররসই এই পত্রিকার প্রধান রস; বীরত্ব অপেক্ষা বীরত্বের অভিমান ইহাতে সমধিক অভিব্যক্ত:

"কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এই কি, নৃমণি?"

এই উক্তিতে নারীহৃদয়ের বীরত্বের অভিমান অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিস্ফুরিত হইয়াছে। কবি বাংলা-কাব্যে ছন্দাংশে যেমন এক সুন্দর নূতনত্ব দিয়া গিয়াছেন, তেমনই সেই ছন্দে বীররসের যে কেমন চমৎকার অভিব্যক্তি হইতে পারে, তাহারও আদর্শ দিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই।

একমাত্র পুত্র প্রবীরের মৃত্যুতে শোকার্তা জনার হৃদয় বীরাঙ্গনোচিত উৎসাহে পূর্ণ:

"যাও বেগে গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি নিনাদে!
টুট কিরীটীর গর্ব্ব আজি রণস্থলে!
খণ্ডমুণ্ড তার আন শূল-দণ্ড-শিরে!
অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে;
নাশ, মহেষাস, তারে!"

এইরূপ উৎসাহব্যঞ্জক উক্তিতে বীররস সত্যই উপভোগ্য হইয়াছে। বীররসের ইহা চমৎকার অভিব্যক্তি।

সেইরূপ শকুন্তলা বা ভানুমতী কিংবা দুঃশলার লিপিতে করুণরসের ব্যঞ্জনা পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে। প্রিয়-বিয়োগে কিংবা প্রিয়জনের বিপদের আশঙ্কায় যে শোক, তাহা হইতে এই রসের উৎপত্তি। মধুসূদনের অসামান্য তুলিকাপাতে বীরাঙ্গনা কাব্যে মেঘনাদবধের ন্যায়, করুণরসের অভিব্যক্তি বাংলা-সাহিত্যে অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে। দুঃশলা তাঁহার স্বামীর জন্য উৎকণ্ঠিতা; অন্তঃপুরে থাকিয়া যুদ্ধবার্তা শুনিয়া তিনি স্বামীর অমঙ্গল-আশঙ্কায় জয়দ্রথকে যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিতে সকরুণ মিনতি জানাইয়া লিখিতেছেন:

ভুলে যদি থাক মোরে, ভুল না নন্দনে
সিন্ধুপতি; মণিভদ্রে ভুল না, নৃমণি!
নিশার শিশির যথা পালয়ে মুকুলে
রসদানে; পিতৃস্নেহ, হায় রে, শৈশবে
শিশুর জীবন, নাথ, কহিনু তোমারে!
... ...
মুদি আঁখি ভাব,—দাসী পড়ি পদতলে;
পদতলে মণিভদ্র কাঁদিছে নীরবে!"

স্বামীর মৃত্যু আশঙ্কায় এই যে মর্মভেদী বিলাপ, ইহা যেন মূর্তিমান্ করুণরস। ইহা যেন দুঃশলার কোমল হৃদয় ফাটিয়া ঝলকে ঝলকে নির্গত হইয়াছে। পাঠকের

চিত্তকে যে ইহা করুণরসে সিক্ত করিয়া তোলে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তেমনি শকুন্তলা-পত্রিকাখানির আদ্যোপান্ত ব্যাপিয়া বিরহিণী নারীর করুণ বিলাপ উচ্ছ্বসিত হইয়াছে।

শৃঙ্গার-রসের বর্ণনাতেও কবি কম সিদ্ধহস্ত ছিলেন না। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একের প্রতি অন্যের অনুরাগ হইতে এই রসের উদ্ভব। উর্বশী কিংবা তারা-পত্রিকায় এই দুই নায়িকার উক্তি শৃঙ্গার-রসের সুন্দর অভিব্যক্তি। আবার শৃঙ্গার-রসের সাত্ত্বিকভাব কবি রুক্মিণীর লেখনীমুখে এমন হৃদয়াবেগের সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যাহা সত্যই উপভোগ্য। প্রেম এখানে নানাবর্ণে সমুজ্জ্বল ও সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সূর্পণখার পত্রিকাখানি কাব্যাংশে প্রকৃত প্রেমের পূর্বরাগের উপযোগী হইয়াছে।

(এই প্রসঙ্গে **'পত্রিকা-বিশ্লেষণ'** অধ্যায়টির আলোচ্য বিষয় স্মরণে রাখিয়া উত্তর রচনা করা সমীচীন হইবে।)

(৩) বীরাঙ্গনা কাব্যে বর্ণিত শকুন্তলা-পত্রিকা ও দ্রৌপদী-পত্রিকা দুইখানির একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা কর এবং বিশেষ-ভাবে কোন্ রস এই পত্র দুইখানিতে প্রাধান্য পাইয়াছে, তাহা দৃষ্টান্ত সহযোগে বুঝাইয়া দাও।

উত্তর ঃ এই পত্রিকা দুইখানিকেই স্মরণার্থ-পত্রিকা বলা যাইতে পারে। স্বামীর অদর্শনে ব্যাকুলা নারীর মর্মবেদনা ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। শকুন্তলা ও দ্রৌপদী-পত্রিকা দুইখানিতে বিরহিণী নারীর অন্তর্বেদনা প্রকাশ পাইলেও ইহাদের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রহিয়াছে। এখানে উভয় পত্রিকার বিষয়বস্তু বিরহ হইলেও পত্রিকা দুইখানির স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। শকুন্তলা বিরহিণী—রাজা দুষ্মন্তের বিরহে তিনি কাতরা। দুষ্মন্তের অদর্শনে তিনি অধীরা, দুষ্মন্তের সহিত মিলনের জন্য তিনি ব্যাকুলা। তাঁহার পত্রের প্রত্যেকটি ছত্রে সেই ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শকুন্তলা সরলা ঋষিবালিকা; তাই তাঁহার পত্রে কেবলমাত্র বিরহিণীর মনোবেদনাই প্রকাশ পাইয়াছে, অন্য কোন বিরোধীভাব প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু দ্রৌপদীর পত্রে বিরহের সহিত ব্যঙ্গ মিশ্রিত হইয়া ইহাকে অন্য আর একরূপ মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়াছে।

পত্রিকা দুইখানির অবলম্বন করুণ-রস। করুণ-রসের স্থায়িভাব হইল শোক বা বিলাপ; যাহার উদ্দেশে বিলাপ করা হয়, সেই ব্যক্তি বা বিষয় ইহার অবলম্বন-

বিভাব ; তাহার সম্পর্কে দর্শন, শ্রবণ, মননাদি ইহার উদ্দীপন-বিভাব। কিন্তু উভয় পত্রিকার করুণ-রসের বেশ একটা পার্থক্য আছে। শকুন্তলা যেখানে পত্রে পূর্বকথা স্বামীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া লিখিতেছেন :

"দ্রুতগতি ধাই আমি সে নিকুঞ্জ বনে
যথায়, হে মহীনাথ, পূজিনু প্রথমে
পদযুগ ; চারি দিকে চাহি ব্যগ্রভাবে।"

ইহা যে মূর্তিমান্ করুণ-রস তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহা পাঠকের চিত্তকে সহজেই বেদনাতুর করিয়া তোলে।

আবার এই করুণ-রসই যখন দ্রৌপদী-পত্রিকায় দেখি :

"পড়িলে এসব কথা মনে, শূরমণি,
কেমনে ভাবিব, হায়, কহ তা আমারে,
অভাগী দাসীর কথা পড়ে তব মনে ?"

তখন কিন্তু আমরা বেদনাতুর হই না—আমরা উপভোগ করি ইহার অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গের মধুর ব্যঞ্জনাটুকু। এইখানেই ধরা পড়ে, শকুন্তলা ও দ্রৌপদী-পত্রিকার মূলগত পার্থক্য। উভয়েই বিবাহিতা, উভয়েই প্রোষিতভর্তৃকা, উভয়েই স্বামীর পুনর্মিলনা-কাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব, কিন্তু এত মিল থাকা সত্ত্বেও দুইটি পত্রিকার প্রকৃতি অভিন্ন নহে। দ্রৌপদী-পত্রে একই সঙ্গে বিবাহিতা পত্নীর যে রহস্যপ্রিয়তা এবং অভিমানিনীর যে দুর্জয় অভিমান ফুটিয়াছে, শকুন্তলা তাহা কোথায় পাইবে? তাহার যে পত্নীত্বের দাবীই এখনও পর্যন্ত কায়েমী হয় নাই। তাই তাহার বালিকাসুলভ কোমল অন্তর সর্বদাই নানা আশঙ্কায় বেপথুমান। অথচ প্রেমের আবেদন তাহার অন্তরে দ্রৌপদীর অপেক্ষা কোন অংশে ক্ষীণ নহে। তাই দ্রৌপদী যেখানে প্রেমের তীব্রতা জানাইবার জন্য স্বচ্ছন্দে ব্যঙ্গের আশ্রয় লইয়াছেন, শকুন্তলা সেখানে কেবল অসহায়ার ন্যায় আপন ভাগ্যের উপর দোষারোপ করিয়া নীরবে দুঃখভার বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এইভাবে দেখা যায়, করুণ-রস বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় তাহা শকুন্তলা-পত্রিকাতেই মর্মস্পর্শী হইয়াছে,—দ্রৌপদী-পত্রিকায় যাহা ফুটিয়াছে, তাহা করুণ-রসের আবরণে মধুরেরই পরিবেশন বলা চলে।

[এই প্রসঙ্গে **'পত্রিকা-বিশ্লেষণ'** নিবন্ধে 'শকুন্তলা' ও 'দ্রৌপদী' পত্রিকাদ্বয় অবশ্য দ্রষ্টব্য।]

(৪) বীরাঙ্গনা-কাব্যে বর্ণিত ভানুমতী-পত্রিকা ও দুঃশলা-পত্রিকা দুইখানির একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা কর।

উত্তর ঃ এই পত্রিকা দুইখানি আদ্যোপান্ত কান্তাবাক্য-সমন্বিত আবেদনে পরিপূর্ণ, এবং করুণ-রস ইহাদের অবলম্বন। উভয় নায়িকাই একই অবস্থায় স্ব স্ব পতিকে পত্র লিখিতেছেন। উভয়েই তাঁহাদের স্বামী কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে লিপ্ত থাকার সময়, অন্তঃপুরে বসিয়া নিয়ত যুদ্ধের বার্তা শুনিয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। ব্যাকুলতার বশবর্তিনী নায়িকাদ্বয় স্বামীর অমঙ্গল-চিন্তায় কাতর হওয়ায় স্বামীকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিয়া পত্র প্রেরণ করিতেছেন। ভাবের এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও পত্রিকা দুইখানিতে বৈচিত্র্যের অভাব নাই।

স্বামীর অমঙ্গল-চিন্তায় ভানুমতীর চঞ্চলতা কবি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

> "কভু যাই দেবালয়ে ; কভু রাজোদ্যানে ;
> কভ গৃহ-চূড়ে উঠি, দেখি নিরখিয়া
> রণস্থল। রেণু-রাশি গগন আবরে
> ঘন ঘনজালে যেন ; জ্বলে শর-রাশি,
> বিজলীর ঝলা সম ঝলসি নয়নে !"

অন্যদিকে স্বামীর জন্য দুঃশলার মনের ব্যাকুলতা এইভাবে প্রকাশ পাইয়াছে ঃ

> কাঁপিছে এ পোড়া হিয়া থরথর করি !
> আঁধার নয়ন, হায়, নয়নের জলে !
> নাহি সরে কথা, নাথ, রসশূন্য মুখে !

তাহার পরই তিনি সোজাসুজি বলিতেছেন ঃ

> "এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি !
> ... ...কি কাজ রণে তোমার ?"

স্বামীর কল্যাণ চিন্তায় ব্যাকুলা নারীর পক্ষে স্বামীর কথা ভিন্ন কাহারও কথা চিন্তা করা স্বাভাবিক নহে—ইহা কবি অতি নিপুণভাবেই এই পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

ভানুমতীর পত্রে আমরা কুরুগৃহের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভীষণ মনশ্চাঞ্চল্যের চিত্র পাই, বিধবা-সধবা সকলেরই মর্মন্তুদ ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাই ; কিন্তু দুঃশলার পত্রে তিনি কেবল তাঁহার কথা, তাঁহার শিশুপুত্রের কথাই বলিয়াছেন। উভয়েই অবশ্য কান্তাবাক্যে স্ব স্ব স্বামীকে নানারূপে বুঝাইয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে লিখিয়াছেন।

দুঃশলা-পত্রিকার মধ্যে যেখানে অর্জুনের জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে উহাতে বীররস ফুটিয়া উঠিয়া সমগ্র লিপিখানিকে একটি স্বতন্ত্র সৌন্দর্য প্রদান করিয়াছে। সপ্তরথী-বেষ্টিত হইয়া ব্যূহমধ্যে বীর অভিমন্যু নিহত হইবার পরক্ষণেই

অর্জুন পুত্রবধের প্রতিশোধ লইবার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অন্তঃপুরে বসিয়া সঞ্জয়মুখে তাহার বিবরণ শুনিয়া দুঃশলার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল তাহার অতি মর্মস্পর্শী বিশ্লেষণ কবি এই পত্রিকায় প্রদান করিয়াছেন। অর্জুনের এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া

"অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদতলে
পড়িনু!"

—পত্রিকার এই অংশে কবি যে নারীকে আঁকিয়াছেন তিনি স্বামীর প্রাণ-বিনাশের আশঙ্কায় প্রাণহীন কায়ামাত্র। এই আশঙ্কা বক্ষে ধারণ করিয়া পত্র লিখিতে হইয়াছে বলিয়া এই পত্রিকায় যে কাতরতা, যে অশ্রুপ্লাবন দেখা দিয়াছে, বীরাঙ্গনা-কাব্যে আর কোথাও তাহার তুলনা নাই।

(উত্তরের অবশিষ্টাংশের জন্য **'পত্রিকা-বিশ্লেষণ'** -নিবন্ধে ভানুমতী-পত্রিকা ও দুঃশলা-পত্রিকা শীর্ষক আলোচনা দুইটি দেখ।)

(৫) বীরাঙ্গনা কাব্যে জনা-পত্রিকায় কবি যেভাবে জনাকে ট্রাজিক চরিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ দাও।

উত্তর : করুণ, বীর ও রৌদ্ররসের সমন্বয়ে জনার পত্রখানি বীরাঙ্গনা কাব্যের অন্যান্য পত্রগুলির মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। করুণ ও বীররসের সহিত রৌদ্ররস মিশাইয়া কবি জনা-চরিত্র এমন দীপ্যমান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, ইহাকে তাঁহার দ্বিতীয় প্রমীলা বলিয়া মনে হয়। ক্ষত্রিয়কন্যা জনা স্বামীর কাপুরুষোচিত ব্যবহারে ব্যথিতা ও ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকে যখন লিখিতেছেন :

"তব সিংহাসনে
বসিছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে!
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি রতনে।"

অথবা,

"কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এই কি, নৃমণি?"

তখন কি মনে হয় না যে, পুত্রশোকাতুরা নারীহৃদয়ের ক্ষত্রতেজ ছত্রে ছত্রে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিস্ফুরিত হইয়াছে? রমণীর মুখে রৌদ্ররসের চমৎকারিত্ব এই উক্তিতে সমধিক ফুটিয়াছে। বীরত্বের অভিমান এইভাবে আগাগোড়া অগ্নিময় ঝঙ্কার তুলিয়াছে। বীরাঙ্গনার এই নায়িকা সর্বাংশে তাই ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত জ্বালাময়ী বিষ উদ্গীর্ণ করিয়াছেন।

জনা মধুসূদনের এক অপূর্ব ট্রাজেডি। ক্ষত্রতেজে তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ। স্বহস্তে পুত্রকে সজ্জিত করিয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়াছিলেন। বীরজননীর বীরপুত্র বীরের ধর্ম পালন করিয়া যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। পুত্রশোকের সেই নিদারুণ শেলাঘাতে জননী-হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও, জনা সামান্যা নারীর ন্যায় শোকে কাতর হইলেন না। বরং পুত্রের বীরত্ব-গৌরবে জনার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। দুঃখ যাহা তিনি পাইলেন তাহা একান্তই স্বামীর জন্য—পুত্রঘাতী শত্রুর সহিত স্বামীর কাপুরুষোচিত ব্যবহারে। চরিত্রটি ট্র্যাজিক হইবার কারণ ইহাই।

স্বামীর এই চরম অবাঞ্ছিত আচরণে জনার অন্তর একেবারে বিষাইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই এই পত্রিকার শুরুতে এক সুদীর্ঘ বক্রোক্তি স্থান পাইয়াছে। জনা খুব ভালই জানেন রাজপুরীতে আজ কিসের উৎসব! যে সমরাড়ম্বর 'প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে' আয়োজিত হইলেই মহেষ্বাস ক্ষত্রমণি নীলধ্বজের পক্ষে শোভন হইত, তাহা যে পুত্রহন্তারই আপ্যায়নের অঙ্গহিসাবে আয়োজিত হইয়াছে মাত্র,— ইহা তেজস্বিনী জনার পক্ষে একান্তই অসহনীয়। তিনি বেশ বুঝিয়াছেন, তাঁহার স্বামীর ক্ষত্রতেজ যে কারণেই হোক বর্তমানে স্তিমিত, অবলুপ্ত-প্রায়; তাই স্বামীকে এই ক্লৈব্য ও কাপুরুষতার গ্লানি হইতে মুক্ত করিবার জন্য জনা প্রকৃত বীরাঙ্গনার ন্যায় স্বামীর চৈতন্যোদয় ঘটাইবার উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গের খোঁচায় খোঁচায় আপন উক্তিকে উত্তরোত্তর অধিকতর সূচীমুখ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যে আচরণ নীলধ্বজের আদৌ সাজে না, তাহারই প্রসঙ্গে জনা বলিয়াছেন:

"এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
মহাবাহু!"

পুত্রের নিধনে যাঁহার বিলাপের কোন লক্ষণই নাই, এবং যিনি ক্ষত্রধর্ম বিসর্জন দিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাকেই জনা বলিতেছেন:

"কি কাজ বিলাপে, প্রভু? পাল, মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম্ম, ক্ষত্রকর্ম্ম, সাধ ভুজবলে।"

—যেন রাজা ক্ষত্রবীরের ন্যায় পুত্রহন্তাকে শাস্তি দিবার জন্য যুদ্ধের উপযুক্ত আয়োজন করিয়াছেন, কেবল পুত্রশোকজনিত বিলাপে বিহ্বল হইয়া পড়িতেছেন, একটু উৎসাহ-উত্তেজনা পাইলেই আর কোন কথা থাকে না;—জনা সেই উৎসাহ দিয়া স্ত্রীর কর্তব্য করিতেছেন মাত্র।

কিন্তু এ সমস্তই যে হতচেতন নীলধ্বজের চৈতন্য ঘটাইবার আয়োজন মাত্র— ইহা বুঝা গেল দ্বিতীয় স্তবকের ভাষণভঙ্গী হইতে। জনা নিজেকে 'পাগলিনী' বলিয়া

পরিচিত করিয়া বুঝাইতে চাহেন যে, এতক্ষণ তিনি তাঁহার স্বামীর আচরণের যে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তাহা পাগলের ভ্রান্তি মাত্র। বক্রোক্তির পর্যায় শেষ করিয়া জনা সোজাসুজি আরম্ভ করিলেন, তবে এ উৎসব যুদ্ধের আয়োজনের জন্য নহে, শত্রুর মনোতুষ্টি বিধানের জন্য! আর অমনি ক্ষোভে, লজ্জায়, ঘৃণায় বীরাঙ্গনার অন্তর ভরিয়া উঠিল। কুপিতা ফণিনীর ন্যায় জনার কণ্ঠে ভৎ´সনা-বাক্য শোনা গেল ঃ

"তব সিংহাসনে
বসিছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে!
... ...
কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এই কি, নৃমণি?"

এইরূপ ধিক্কারেও নীলধ্বজের অন্তরে প্রতিহিংসানল উদ্দীপিত হইবে না বুঝিয়া জনা অন্য পথ অবলম্বন করিলেন। তিনি অর্জুনের অন্যায় যুদ্ধ এবং চরিত্রের দুর্বলতার কথা স্বামীকে স্মরণ করাইয়া দিলেন।

এই ব্যাপারে জনার কৌশল-নৈপুণ্য ও মানস-লোকের যে পরিচয় কবি দিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। অর্জুনকে ছোট করিবার জন্য কেবল অর্জুনের হৃদয়ে প্রতিহিংসার আগুন জলিয়া উঠিয়াছে। তাই যে মুহূর্তে তিনি দেখিলেন যে, প্রতিহিংসা লওয়া দূরে থাক, তাঁহার স্বামী অর্জুনকে মিত্রভাবে রাজসভায় আনিয়া মিত্ররূপে, সম্মানিত অতিথিরূপে আপ্যায়িত করিতেছেন, সেই মুহূর্তে জনার জীবনে ট্র্যাজেডির আবির্ভাব ঘটিল। আপনার সর্বশক্তিপ্রয়োগেও হতচেতন স্বামীকে জাগাইতে না পারিয়া মৃতপুত্রের বীরত্বমণ্ডিত পবিত্র স্মৃতি স্মরণ করিয়া জনা স্বামীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবারই সংকল্প গ্রহণ করিলেন। জনার নারী-হৃদয়ে ক্ষত্রধর্মের ও আত্মমর্যাদার এই প্রশংসনীয় পরিণতির জন্য মধুসূদনের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব ও মৌলিকত্ব স্বীকার করিতে হয়। কোন সাধারণ নারী জনার সাদৃশ্য বহন করিতে পারিবে না। সাধারণ নারীর পক্ষে পুত্রশোকের মধ্যে আর কোন চিন্তাকে মনে স্থান দেওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু জনায় আমরা অন্য চিত্র দেখি।

পুত্রশোকেও যে হৃদয় বিহ্বল হয় নাই, স্বামীর উপেক্ষায় তাহা একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। পুত্রহীনা জনার একমাত্র গতি ছিলেন স্বামী। কিন্তু তিনিও যখন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন ঐহিক জীবনে জনার আর কোনও আসক্তি রহিল না।

এইভাবে কবি যে কেবল জনার 'ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে' এই সংকল্পের যৌক্তিকতা দেখাইলেন, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে জনার ট্র্যাজেডি-আকাশের

করে ;—তাঁহাকে বলিতে হয়, 'গুরুজন তুমি; পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।'—এই দ্বন্দ্বের উপরেই গঠিত জনার গগনস্পর্শী ট্র্যাজেডি-স্তম্ভ।

কিন্তু আরও একটু গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে মনে হইবে যে, জনার অন্তরে আসল কথাটি হইল আত্মমর্যাদাবোধ এবং ইহাকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার চরিত্রের অন্যান্য গুণসকল বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। একমাত্র পুত্র ক্ষত্রিয়ের মর্যাদারক্ষার্থে অসমযুদ্ধে রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছে বলিয়াই তো জনার নিকট তাহা এত আদরণীয়। কিন্তু শোকের সহিত আত্মসম্মানের মহৎ আদর্শ মিলিত হইয়া জনা-চরিত্রে এক ট্রাজিক মহত্বের আরোপ করিয়াছে।

জনার নারী-চরিত্র যে কতদূর মহৎ প্রেরণার উদ্বুদ্ধ, তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি, যখন আমরা লক্ষ্য করি যে, একমাত্র প্রিয়পুত্রের মৃত্যু তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং তাহা শুনিয়া সহ্যও করিয়াছেন অবিচলিতভাবে। কিন্তু চরিত্রমহত্বে জনা আরও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। কেবল পুত্রের মৃত্যুশোকে অবিচলিত থাকা নহে, সেই সঙ্গে ক্ষত্রধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে তিনি স্বামীকেও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। তিনি যে ক্ষত্রিয় নারী, ক্ষত্রিয় স্ত্রী এবং ক্ষত্রিয়ের মাতা এই কথা কিছুতেই ভুলিতে পারেন নাই। তাই ক্ষত্রধর্মোচিত বীরত্বে জনার জীবনেতিহাসের কলঙ্কজনক কাহিনীই যথেষ্ট নহে, মহারাজ নীলধ্বজের মহিমা-কীর্তনও অপরিহার্য। দুইজনকে পাশাপাশি রাখিয়া জনা অকাট্য প্রমাণ দিয়া দেখাইতে চাহেন যে, অর্জুন ও নীলধ্বজের মধ্যে যে পার্থক্য তাহার সাদৃশ্য একমাত্র চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণের মধ্যেই মিলিতে পারে। অথচ আজ যদি সেই 'চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে' আসিয়া উঠে তবে সেই ব্রাহ্মণের কতদূর অধঃপতন হইয়াছে ইহা কি বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন আছে? জনার দৃষ্টিতে নীলধ্বজ আদৌ সামান্য বীর নহেন, তাঁহার বীরদর্প, মানদর্প সমস্তই আছে,—"মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী"র আত্মশ্লাঘা করিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে, কিন্তু যেন কোন ছলনার প্রভাবে তিনি সে সব ভুলিয়া আছেন ; এইভাবে জনা আপন স্বামীকে তাঁহার মহত্ত্ব সম্পর্কে সজাগ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখানে ভিতরে প্রতিহিংসার রুদ্রতা থাকিলেও স্বামীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও কোমলতা কিছুতেই বিসর্জিত হয় নাই। এই উভয়ের মধ্যে এক কঠিন দ্বন্দ্ব জনার ট্র্যাজেডিকে মর্মন্তুদ করিয়া তুলিয়াছে। যে মুহূর্তে তাঁহাকে অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া স্বামীকে ধিক্কার-জর্জরিত করিয়া উত্তেজিত করিতে হইবে, সেই মুহূর্তেই অন্তর হইতে আসিতেছে নারী-ধর্মের অনুশাসন—স্বামীর প্রতি রূঢ় আচরণের পাপ তাঁহার রসনাকে অর্গলিত

আর একটি দিগঙ্গনে সুপ্রচুর আলোকপাত করিলেন, যে আলোতে আমাদের চোখে উজ্জ্বল হইয়া উঠে জনা-চরিত্রের করুণরস—এই তেজস্বিনী বীরাঙ্গনার এক অশ্রুসজল করুণ মূর্তি ঃ

দুরন্ত ফাল্গুনি

*   *   *

নিঃসন্তানা করিল আমারে !
তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি ! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে ?
হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে !"

পরিণত বয়সে নারীর পক্ষে বাঁচিবার যে দুইটি মাত্র সূত্র—এক মা হইয়া, আর এক পত্নী হইয়া,—সে দুইটিই এখানে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। পুত্র অন্যায় যুদ্ধে নিহত, স্বামী জীবিত থাকিয়াও জনার পক্ষে নির্জীব, কারণ স্বামীকে তিনি যেভাবে দেখিতে চাহেন, স্বামী তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং জনা সম্বন্ধে বলা যায়, এখানে ব্যক্তিগত সত্তা যাহা চাহিয়াছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাকে অস্বীকার করিয়াছে। দৃঢ়তায়, মহিমায়, ক্ষত্রবীর্যে যাহা বনস্পতির ন্যায় সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা আত্মমর্যাদার হানিতে এবং আদর্শের অপমানে ভাঙিয়া পড়িল। ইহার বেদনাই জনা-চরিত্রের মূলীভূত ট্র্যাজেডি। জনার শোচনীয় মৃত্যু এই ট্র্যাজেডির উপকরণ নহে। যে শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়া তিনি মৃত্যুকে বরণ করিলেন, তাহাই বীরাঙ্গনা-জনার জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় ট্র্যাজেডি। জনার অন্তরের মহৎ আদর্শ বাহিরের নিষ্করুণ আঘাতে বিশুষ্ক হইয়া যে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে, কবি তাহাকেই ট্র্যাজেডিতে রূপান্তরিত করিয়া চরিত্রটির সার্থক পরিণতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

৬। বীরাঙ্গনা কাব্যে বর্ণিত কেকয়ী-পত্রিকা ও জনা-পত্রিকা দুইখানির একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা কর।

উত্তর ঃ কেকয়ীর ও জনার পত্র সমশ্রেণীভুক্ত হইলেও উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্যরেখা বর্তমান তাহা নিতান্ত সূক্ষ্ম নহে। সাদৃশ্যের মধ্যে, উভয়ই অনুযোগ-পত্রিকা, লেখিকা উভয়ক্ষেত্রেই তেজস্বিনী রমণী, স্বামীর বিসদৃশ আচরণে মর্মপীড়িতা; পত্রলিখনের হেতু উভয়ক্ষেত্রেই স্বামীর চরম উপেক্ষা। উভয় লেখিকাই স্বামীর অধর্ম ও অকর্তব্য চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া হতচেতন স্বামীর চৈতন্য জাগাইতে চাহেন। এই অধর্ম ও অকর্তব্যের দায়ে অভিযুক্ত দুইজনই পুরাণ-প্রসিদ্ধ স্বনামধন্য

নরপতি এবং দুইয়েরই প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধার অন্ত নাই, অথচ স্ব স্ব পত্নীর নিকট উভয়েরই অপরাধ এমনই গুরুতর যে, পত্নীদ্বয় স্বামীগৃহ পরিত্যাগের সংকল্প না জানাইয়া থাকিতে পারেন না।

কিন্তু এত মিল থাকাসত্ত্বেও জনা ও কেকয়ী-পত্রিকার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের এক পাষাণ-প্রাচীর বিদ্যমান। যে মৌলিক ব্যবধান আলোচ্য পত্রিকা দুইটিকে সমশ্রেণীর হওয়া সত্ত্বেও একেবারে পৃথক্ করিয়াছে, তাহার ভিত্তি খুঁজিতে হইবে লেখিকাদ্বয়ের প্রকৃতির মধ্যে। যে তেজ, বীরত্ব ও উষ্মা এই দুইটি অনুযোগ-পত্রিকাকে সমশ্রেণীর করিয়াছে, কেকয়ীর ক্ষেত্রে তাহার উৎস হইল নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থ, আর জনার ক্ষেত্রে এক সুমহান আদর্শবোধ।

রাজার দুর্বল মুহূর্তের এক মুখের কথার দোহাই দিয়া সপত্নী-পুত্র জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের স্থলে আপন পুত্র ভরতের জন্য সিংহাসনের দাবী জানানো—আর, ক্ষত্রিয় হইয়া ক্ষত্রধর্মের অবমাননা—এবং আপন পুত্রকে যে অন্যায় যুদ্ধে নিহত করিয়াছে সেই পুত্রহন্তাকেই মিত্ররূপে আপ্যায়নের অধঃপতন হইতে স্বামীকে উদ্ধার করিবার বীরোচিত প্রয়াস,—এই দুইয়ের মধ্যে কতই না পার্থক্য! এক অতি অনুদার মনের বশবর্তী হইয়া মধুসূদনের কেকয়ী লেখনী ধারণ করিয়াছেন বলিয়াই, কেবল একটি সত্যবিস্মৃতির জন্য আপন স্বামীকে তিনি এত জঘন্য ব্যঙ্গের খোঁচায় জর্জরিত করিতে পারিয়াছেন। স্বামীকে 'রাজ-ঋষি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া—'পাইলা কি পুনঃ এ বয়সে রসময়ী-নারী ধনে' এই জিজ্ঞাসার মধ্যে লজ্জা দেওয়ার যে রীতি, অথবা

"কাম-মদে মাতি যদি তুমি
বৃথা আশা দিয়া মোরে ছলিলা..."

* * *

"কামীর কুরীতি এই শুনেছি জগতে
অবলার মনঃ চুরি করে সে সতত
কৌশলে,"

ইত্যাদি উক্তির মধ্যে যে ইঙ্গিত, তাহা কেবল অমার্জিতই নয়, একেবারে কুৎসিত বলা চলে। এরূপ কোন কলুষস্পর্শ জন-পত্রিকায় কুত্রাপি পাওয়া যায় না। জনার পত্রে যে ব্যঙ্গের আভাষ নাই, তাহা নহে; প্রথম স্তবকের সমস্তটাই এক হিসাবে ব্যঙ্গের সুরে বাঁধা। কিন্তু তাহা এতই সংযত ও সুন্দর যে, তাহাকে ব্যঙ্গ বলিয়া চেনাই যায় না। তাহা ছাড়া ইহার একটি ছত্রও সুরুচি-বর্জিত নহে।

দ্বিতীয়ত, জনা যাহাকে অধর্ম বলিয়াছেন তাহা যে বিচারে অধর্ম, সেখানে কোন খুঁত নাই। ক্ষত্রিয় হইয়া অন্যায়ের প্রতিবিধান না করা, অহেতুক অপমান সহ্য

করা, আত্মসম্মান বিসর্জন দেওয়া যে ঘোরতর অধর্ম ইহাতে আর সন্দেহ কি? এবং এই অধর্ম জনিত যে অন্যায় তাহা সত্যই বিশেষ উত্তেজনারই কারণ হইতে পারে। কিন্তু কেকয়ী যাহাকে অধর্ম বলিয়াছেন তাহার মূলে আছে এক সত্য-বিস্মৃতিমাত্র। সেই সত্যও আবার সেবা-প্রাপ্ত পুরুষের কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি স্বরূপ কোন এক দুর্বল মুহূর্তের অসংযত বর-দান ছাড়া আর কিছু নহে। সহধর্মিণী হইয়া স্বামীর এই দুর্বলতার সুযোগ লওয়ার মধ্যে কোন মহত্ত্ব নাই। অবশ্য রাজা দশরথ যে সত্যভ্রষ্ট ইহা অস্বীকার করা যায় না;—কিন্তু তাঁহার এই বিস্মরণ-জনিত পত্নীর ঈপ্সিত কার্যের অকরণ, আর, নীলধ্বজের পক্ষে ক্ষত্রধর্মের ও আত্মমর্যাদার স্বেচ্ছাকৃত উপেক্ষা বা অবহেলা—এই দুইটি অন্যায়ের মাত্রা কখনই এক হইতে পারে না। অথচ পত্নীর উত্তেজনার বেলা দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত অনেক দুর্বল কারণেই কেকয়ীর উত্তেজনা জনার অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। জনা উত্তেজনার মধ্যে কোথাও আত্মসম্বিৎ হারান নাই। স্বামীকে মৃদু তিরস্কার করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মনে জাগিয়াছে, স্বামী গুরুজন, তাঁহাকে গঞ্জনা দিলে তিনি নিজে বিষম পাপে পড়িবেন। তাহা ছাড়া, স্বামীর কর্তব্যবোধ জাগাইবার জন্য তিনি তাঁহার ভাষণের মধ্যে যত কঠোরই হউন, কোথাও অশ্রদ্ধাপূর্ণ সম্বোধন বা উক্তি ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু কেকয়ীর পত্র পড়িয়া মনে হয়, নায়িকা একেবারেই আত্মসম্বিৎশূন্য। আদ্যোপান্ত কড়া বিদ্রূপের সুরে বাঁধা এই পত্রিকায় স্বামীর প্রতি যে চরম অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার তুলনা আমাদের সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না।

আসল কথা, বীরাঙ্গনা-সৃষ্টির অত্যুৎসাহে কবি স্বয়ং কেকয়ী-পত্রিকায় সংযম রাখিতে পারেন নাই। উৎকৃষ্ট সংযমের গুণে জনার তেজস্বিনী রূপকে আমরা যতখানি শ্রদ্ধা করিতে পারি, সংযমের অভাবে কেকয়ীর তেজস্বিনী মূর্তিকে ঠিক ততখানি অশ্রদ্ধা করিতেই প্রবৃত্ত হই। উভয় নায়িকাই গৃহত্যাগের সঙ্কল্প জানাইয়াছেন; কিন্তু এই প্রসঙ্গে উভয়ের মনোভাবের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখা যায়। জনার যাইবার সময়েও স্বামীর জন্য অন্তর কাঁদিতেছে; শূন্য পুরীতে রাজা তাঁহাকে "কোথা জনা?" বলিয়া ডাকিয়া যখন কেবল প্রতিধ্বনিই শুনিতে পাইবেন, স্বামীর তখনকার সেই মনোবেদনার কথা ভাবিয়া সমবেদনাকাতর জনার নারী হৃদয় আগেই ভাঙিয়া পড়িতে চায়, কিন্তু সংকল্পের দৃঢ়তায় নিজেকে তাঁহার আবার শক্ত রাখিতে হয়। কোমলে-কঠোরে জনার এই যে পরিচয় ইহা তাঁহার চরিত্র ও মনের গঠনটিকে এমন এক সমুন্নতি (sublimity) দান করিয়াছে, যাহার ত্রিসীমানায় কেকয়ীর আসিবার কোন অধিকার মানিয়া লওয়া যায় না। কেকয়ীও বলিতেছেন,

"যাই চলি আমি";—কিন্তু ইহা কেবল জব্দ কর' কথা। ইহার অব্যবহিত পূর্বেই তাঁহার মুখে—"এত যে বয়েস, তবু লজ্জাহীন তুমি!"—উক্তিটি এতই কুশ্রী ও কদর্য শুনায় যে, যে-কোন ভারতীয় নারী স্বামীর প্রতি—এরূপ উক্তিতে ঘৃণায় শ্রবণপথ রুদ্ধ না করিয়া পারে না। তাহা ছাড়া কেকয়ী নিজেই কেবল পুরীত্যাগ করিবেন না, তাঁহার পুত্রকেও দশরথের অন্নগ্রহণ তো দূরের কথা, এমন কি এই পাপপুরীতে প্রবেশ করিতেও দিবেন না। এই ধরণের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া মনে হয় যেন মাইকেল আমাদের পল্লীর নিম্নশ্রেণীর কুরুচিবিশিষ্টা নারীর মুখের কথা তুলিয়া আনিয়া কেকয়ীর মুখে বসাইয়া দিয়াছেন। আর, সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল, কেকয়ীর মুখের,

"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি"

এই উক্তিটির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি। স্বামীর অন্যায়ের জন্য জনাও স্বামীকে আঘাত দিয়াছেন, কিন্তু সে আঘাত যেন আঘাতদাত্রীকেও কাতর করিয়াছে; কিন্তু কেকয়ী যখন রকম রকম করিয়া 'পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি' এই ভয়ঙ্কর প্রচারের পরিকল্পনা করিতে থাকেন, তখন সেই রঘুকুলপতির সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পর্কটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে চাহে, আর, যেন এক উৎকট উল্লাস নায়িকাকে পাইয়া বসে।

জনা বীরাঙ্গনা হইয়াও ভারতীয় নারী; কিন্তু রুক্ষতা ও রুদ্রতার আতিশয্যে, এবং বিশেষ করিয়া সহধর্মিণীর মুখে স্বামীর প্রতি অভিশাপ ও তাঁহার আতঙ্কোদ্রেকের কথায় কেকয়ীকে ভারতীয় নারী বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। জনা-পত্রিকার উৎকর্ষ—ইহার অনুপম সামঞ্জস্যে—বীর-রুদ্র-করুণ-রসের অপূর্ব সমন্বয়ে—ট্রাজিক সুরের মূর্ছনায়—কেকয়ী-পত্রিকায় না আছে ট্রাজিক স্পর্শ, না আছে কারুণ্যের আবেদন,—আছে শুধু বীর-রুদ্রের অগ্নিস্রাব, যাহা যথেষ্ট উত্তেজনা জাগাইলেও অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারে না।

৭। পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যে 'বীরাঙ্গনা কাব্যের' পরিণতি কি হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও।

উত্তর : নারীত্বের প্রতি নবজাগ্রত শ্রদ্ধাবোধের যে পরিচয় মাইকেল তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্যের' প্রমীলা চরিত্রে দিয়াছেন, তাহারই এক নূতন রূপ আমরা 'বীরাঙ্গনা কাব্যের' নায়িকাদের চরিত্রে পাই। বীরাঙ্গনা কাব্যের নায়িকাদের আত্মিক বল আরও বেশী। এখানে সকল অঙ্গনাই বীর্যবতী—সকলের প্রেম মহিমার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই যে আত্মিক দৃঢ়তার পরিচয়, ইহা সর্বতোভাবে ভারতীয় সংস্কারেরই অনুকূল। কবির বীরাঙ্গনা কাব্যের মূল্য তাই বিশেষভাবে বিবেচনা-

যোগ্য। প্রথমেই নারীত্বের পূর্ণতা সম্পর্কে উনবিংশ শতকের প্রচলিত মনোভাবকে পরিস্ফুট করা সঙ্গত। অন্যতর প্রসঙ্গে ব্যবহৃত মনীষী সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন, "প্রেমের একান্ত বন্ধনে নারী যেখানে পুরুষের সমব্রতধারিণী, পুরুষের আশা, গর্ব, উৎসাহ, শৌর্য, বীর্য, ধর্ম যাহা কিছু পরম সাধু, পরম প্রেয় ও পরম শ্রেয় আছে, তাহারই সেখানে স্বাধিকার, সেখানেই নারীর যথার্থ মহিমা।" এই উক্তির আলোয় নারীর উন্নতিবিষয়ক সমস্ত প্রচেষ্টাকে সমশ্রেণীভুক্ত করা চলে। সতীদাহ-নিবারণ হইতে বিধবা-বিবাহ আইন প্রকটন, এমন কি বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রণয়ন পর্যন্ত এই এক সুরেরই পুনর্বিন্যাস। সংস্কৃত-সাহিত্যে যজ্ঞানুষ্ঠানে পত্নীর কৃত্য আছে, সেই হিসাবে তাহাকে সহধর্মিণী বা পত্নী বলা হয়। কিন্তু যজ্ঞের যুগ অতীত হইলে, মানুষের কার্যক্ষেত্রের মধ্যে নারীকে আর কোন অংশ দেওয়া হয় নাই। যজ্ঞকার্যের সহধর্মিণীত্ব যজ্ঞের সঙ্গেই শেষ হইয়াছে। সেইজন্য পরবর্তী কালের সংস্কৃত সাহিত্যে অধিকাংশ স্থলেই নারী নর্মসহচরী ভোগসঙ্গিনীরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাহাতে তাহার যথার্থ মহিমা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কালিদাসের 'রঘুবংশম্'-এ রাজা অগ্নিবর্ণকে নিশ্চয়ই এই প্রসঙ্গে প্রথমে মনে পড়িবে। উনিশ শতকের জাগ্রত বাংলায় রাজা অগ্নিবর্ণের ন্যায় পুরুষের প্রতি ধিক্কার ধ্বনিত হইয়াছে, পক্ষান্তরে সেখানে শৌর্যে, বীর্যে, ত্যাগে, সাহসে প্রকৃত পুরুষসিংহের প্রতি যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে—সেই আকাঙ্ক্ষাকে ফলবতী করিতে পুরুষের প্রেরণাদায়িনী উদ্দীপ্ত অঙ্গনার প্রয়োজন হইল এই শতাব্দীর মানসে ও মননে—তাই বীরাঙ্গনায় স্থান লাভ করিয়াছে কেকয়ী, জনা ও জাহ্নবী।

শক্তিশালী সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে মাতৃকা-জাতিকেই হইতে হইবে সম্যক বলদৃপ্ত, সত্যে স্থির, ন্যায়ে দৃঢ় ও কর্তব্যে অবিচলিত। 'বীরাঙ্গনা'র প্রথমেই শকুন্তলাপত্র। রাজা দুষ্মন্ত কাব্যসুন্দরী শকুন্তলার সহিত গোপনে মিলিত হইয়াছেন, অথচ তাঁহাকে তাঁহার অন্তঃপুরচারিণী সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার নারীত্বের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। নিঃশব্দচারিণী শকুন্তলার অব্যক্ত বেদনার মধ্যে তাই সত্যের বিস্ফোরণ হৃদয়গোচর হয়। স্বভাব-সরল শকুন্তলা রাজ-প্রেমের তির্যক পরিণতি দেখিয়া বিস্ময়-বিমূঢ়া। তথাপি শকুন্তলার অশ্রুসজল অনুভূতির মধ্যে আমরা যেন সেই কথাই শুনিতে পাই, যে কথা রবীন্দ্রনাথের লেখনী হইতে পরবর্তী কালে উৎসারিত হইয়াছিল :

"রব না বাসর কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী
আমার প্রেমের গর্বে কর অশঙ্কিনী।"

এই যে অন্তরের দৃপ্ত তেজ, বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রত্যেকটি লিপিতে ইহা অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় বিচ্ছুরিত।

তারা পত্রিকায় নারী-প্রেমের যে-রূপ কবি উদঘাটিত করিয়াছেন, তাহাকে ভোগাশ্রয়ী বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না। জীবনধর্মী কবি মধুসূদন তাহার মনো-বেদনা যেভাবে বুঝিয়াছিলেন, তাহা জীবনের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের ফলশ্রুতি। ইহাকে কোন সমাজ শাস্ত্র-বিধানের নির্মমতায় নিবারণ করা চলে না। কারণ, বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি বিমুখ হইয়া স্বামীর তরুণ শিষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কেবলমাত্র বাহিক ঘটনা নহে, ইহা নারীর অন্তরের বহুব্যাপিনী অনুভূতি-উপলব্ধির ঘনতম সত্য রূপ। মধুসূদনের তারাই পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের শৈবলিনী, কিরণময়ী, চারু (নষ্টনীড়)-র সূচনা করিয়াছে।

মধুসূদন মূলত কবি। কবি-হৃদয়ের আশ্চর্য ক্ষমতাবলে তিনি জানিয়াছেন—জীবনে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য উভয়ই সত্য—উভয়ই সমাজের সৃষ্টি; ইহার জন্য ব্যক্তি-মানুষকে দায়ী করা চলে না! "জীবনের আশা, হায়, কে ত্যেজে সহজে"—শকুন্তলার এই একটি মাত্র কথার মধ্যেই কবি যেন বীরাঙ্গনা কাব্যের মর্মকথাটি ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহারই মধ্যে কবির জীবন-দর্শন ও জীবন-সত্য প্রতিফলিত হইয়াছে। এই জাতীয় 'healthy paganism' বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তন করিয়া মধুসূদন তাঁহার পরবর্তী কালের সাহিত্যরথীদের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। জীবনের বাস্তব সত্যের মুখোমুখী দাঁড়াইয়া নারী কি ভাবে তাহার অন্তরের মহিমাকে মেলিয়া ধরিতে পারে—বীরাঙ্গনার প্রত্যেকটি নায়িকা তাহার দৃষ্টান্ত। আত্মিক প্রেমের বলে বীর্যবতী বীরাঙ্গনা জাহ্নবী, জনা প্রভৃতির উত্তরসাধিকা হিসাবেই যেন পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের দেবযানী, চিত্রাঙ্গদা, গান্ধারী প্রভৃতি মহীয়সী নারী-চরিত্র দেখা দিয়াছে। এইখানেই বীরঙ্গনা কাব্যের প্রকৃত সার্থকতা।

৬। দুরূহ বাক্য ও শব্দাবলীর অর্থ

প্রথম সর্গ

আশামদে—আশারূপ মদে। মত্ত—প্রমত্ত। পবন-স্বনন—বাতাসের শব্দ। মদকল—মত্ততার জন্য মধুর অস্ফুট শব্দকারী। করী—হস্তী। অমনি চমকি… কিঙ্করী সহ—বাতাসের শব্দ শুনিতে পাইলে কিংবা আকাশে ধূলারাশি দেখিতে পাইলেই শকুন্তলা মনে করিতেন যে, মহারাজ দুষ্মন্ত বুঝি রথ, অশ্ব, গজ ও দাস-দাসী পাঠাইয়া দিয়াছেন তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য। এখানে উৎকণ্ঠিতার মনোভাব অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। স্মরিলা—স্মরণ করিলেন, মনে করিলেন। বিলাপি বিষাদে—দুঃখের সহিত বিলাপ করিয়া। প্রফুল্লিত—প্রফুল্ল (এই প্রয়োগ মধুসূদনের)। গুঞ্জর—গুঞ্জনধ্বনি। স্রোতোনাদ—স্রোতোস্বিনীর কল্ কল্ ধ্বনি। মরমরে—মর্মরধ্বনি করিয়া। সুধি—জিজ্ঞাসা করি। গঞ্জি—ভর্ৎসনা করিয়া। পিককুল পতি—কোকিলের রাজা, অর্থাৎ প্রশস্ত কোকিল। মধু—বসন্ত। শোন্, পত্র…নৃপতি—শকুন্তলা এই উপলক্ষে দুষ্মন্তের উপেক্ষার ভাবটি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বৃক্ষের পত্র যতক্ষণ সরস থাকে, বাতাস ততক্ষণ তাহাকে লইয়া খেলা করে, প্রেমের আনন্দে তাহাকে নাচায়। কিন্তু সেই পত্র যখন কালে রসহীন হইয়া পড়ে, তখন বাতাস তাহাকে ঘৃণায় মাটিতে নিক্ষেপ করে। শকুন্তলা এখানে পত্রের সহিত নিজেকে এবং বাতাসের সহিত দুষ্মন্তকে তুলনা করিয়াছেন। এই দীর্ঘকাল তাঁহাকে মহারাজ ভুলিয়া আছেন, ইহাতেই শকুন্তলার আশঙ্কা হইয়াছে যে, বোধ হয় দুষ্মন্ত তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। রসহীন পত্রের উপমা-সহযোগে কবি অতি সুন্দরভাবে শকুন্তলার মনের সেই আশঙ্কাই প্রকাশ করিয়াছেন। রসাল—আমগাছ। উন্মীলি—চক্ষু খুলিয়া। শিলীমুখ—ভ্রমর। আক্রম—আক্রমণ কর। পুরু-কুল-নিধি—পুরুবংশের রত্ন অর্থাৎ দুষ্মন্ত। কান্ত—প্রিয়। আদরে—আদর করে, ভালবাসে। গীতিকা—গান; ছন্দোবদ্ধ লিপি। যথায় বসি…অভাগী—যেখানে বসিয়া পদ্মপত্রে শকুন্তলা দুষ্মন্তকে পত্র লিখিয়াছিলেন। পদ্মপর্ণ—পদ্মপাতা। প্রভঞ্জন—বায়ু। কৃতাঞ্জলি-পুটে—দুই হাত জোড় করিয়া। লেখন—পত্র। মনোরথ-গতি—দ্রুতগতি। সম্বোধি কুরঙ্গে…কৃপা করি—এইখানে কবি শকুন্তলার মনের বিরহ-অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। আশ্রমে হরিণ-শিশুকে তিনি সযত্নে পালন করিয়াছিলেন। মনের গতি যেমন দ্রুত, তেমনি হরিণের চরণের গতিও খুব দ্রুত। সেই দ্রুতগতি

হরিণকে দিয়া শকুন্তলা রাজার নিকট পত্র পাঠাইতে চাহিতেছেন। সে যেন সত্বর দুষ্মন্ত-সমীপে পত্রখানি লইয়া গিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করে—এই অনুরোধই শকুন্তলা তাঁহার সযত্ন-পালিত হরিণটির নিকট করিতেছেন। বিবশা—কাতর। রোষে—রাগ করে। ঋষিবালা—অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নাম্নী শকুন্তলার সখীদ্বয়। নিন্দে—নিন্দা করে। অন্তরিত—অন্তর্গত, মনোগত। যে তরুর মূলে·· সে নিকুঞ্জধামে—শকুন্তলা তাঁহার পত্রে তাঁহার মনের বিরহ বর্ণনা করিবার সময় দুষ্মন্তের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইতে নিকুঞ্জ-বাসরে তাঁহার সহিত মিলনের কাহিনী রাজাকে একে একে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। এখন তাঁহার নিকট সেই লতামণ্ডপ নিতান্ত শূন্য বোধ হইতেছে। এই কি রে, ফলে ফল প্রেমতরুশাখে?—এই উপমাটি বড় সুন্দর হইয়াছে। বৃক্ষ হইলেই তাহাতে ফুল ও ফল হইয়া থাকে। কিন্তু প্রেমরূপ বৃক্ষে যে এইরকম ফল ফলিবে অর্থাৎ স্বামীর এই নিষ্করুণ বিস্মৃতি—তাহা শকুন্তলা জানিতেন না। পিতৃস্বসা—পিতার ভগ্নী, পিসিমা। কবরী—খোঁপা। বাকলে—গাছের ছালে। পসারি—বাড়াইয়া। পীড়েন—পীড়ন করেন; যন্ত্রণা দেন। দ্বিরদ-রদ—হস্তীদন্ত। বিদ্যাধরী-গঞ্জিনী—যাহার রূপের কাছে স্বর্গের বিদ্যাধরীরাও লজ্জা পায়। অলকা-সদনে—কুবেরের রাজধানী অলকাপুরীতে। অমূল-রত্নে—অমূল্যরত্নে। সসাগরা—সাগরসহিতা, অর্থাৎ বিপুলা। রাজীব-চরণে—পদ্মের ন্যায় পদযুগলে। বাকল-বসনা—বল্কল-পরিহিতা। কলাধর—চন্দ্র। চির-অভাগিনী…পরের পালনে—এইখানে শকুন্তলা তাঁহার আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছেন। তিনি চির অভাগিনী, কারণ শৈশবে তাঁহার পিতামাতা (বিশ্বামিত্রের ঔরসে স্বর্গের অপ্সরা মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম) তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। ঋষি কণ্ব তাঁহাকে কন্যাজ্ঞানে লালন-পালন করিয়াছিলেন। কি বলে—কি বলিয়া। পরাণ—'পরাণে' হওয়া সঙ্গত, প্রাণে। চর—দূত, এখানে পত্রবাহক।

দ্বিতীয় সর্গ

গুরুপত্নী—দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট চন্দ্র বিদ্যার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন। বৃহস্পতির স্ত্রী তারা চন্দ্রের গুরুপত্নী। লেখনী—কলম। হস্তদাসী সদা…পদাশ্রিত লতা—তারা যে মনে মনে চন্দ্রকে ভালবাসিয়াছেন পত্রে সেই কথাই তিনি ব্যক্ত করিতে গিয়া লেখনীকে বলিতেছেন, সে কেমন করিয়া এই পাপ কথা লিখিল। কলম হস্তদ্বারা চালিত হয় আর হাত মনের দ্বারা চালিত হয়—তাই ইহা সম্ভব হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত হইল, বনের আগুনে যখন গাছের শীর্ষদেশ পুড়িয়া যায়, তখন সেই গাছের আশ্রিত লতাও কি দগ্ধ হয় না? সেই রকম, মন যদি পুড়িয়া

যায়, তবে সেই মনের অধীন করধৃত লেখনীও নিশ্চয় দগ্ধ হইয়া যাইবে। হে স্মৃতি···পাপিনী তারা—কেহ যখন কোন দুষ্কর্ম করে, তখন সে যেমন উজ্জ্বল আলোকে করিতে পারে না, অন্ধকারের প্রয়োজন হয়, তেমনি স্মৃতিরূপ উজ্জ্বল আলোককে তারা নিভাইয়া দিতে চাহেন। তিনি কে, তাঁহার প্রেমাস্পদ কে, তাঁহাদের মধ্যে সম্পর্ক কি—ইত্যাদির স্মৃতি না ভুলিলে তারার বর্তমান মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে না। ধিক্, বৃথা চিন্তা তোর—হে বৃথা চিন্তা তোরে ধিক্। পাবক—অগ্নি। মীনধ্বজ—মৎস্য অঙ্কিত পতাকা যাহার। নিজ রাজ্য ত্যজি · তুমি না রক্ষিলে ?—তারার মনটি যেন চন্দ্রের রাজত্ব। সেই রাজত্ব ত্যাগ করিয়া চন্দ্রদেব অধ্যয়ন করিতেছেন। সেই অবসরে মদন যেন তারার মনরাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন; চন্দ্র ভিন্ন কে এখন তাঁহাকে রক্ষা করিবেন—ইহাই পত্রে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ঘৃণিনু—ঘৃণা করিলাম। স্মরি—স্মরণ করিয়া। মৃগমদে—কস্তুরীকে। মধুরে—বসন্তকে। যৌবন-বন-ঋতুরাজ—তারার যৌবনরূপ বনে সোমদেব যেন বসন্তস্বরূপ। মুরজ—মৃদঙ্গ। তুম্বকী—একতারা। মেঘনাদে—মেঘের গর্জনে। অবচয়ি—চয়ন করিয়া। শরমে—সরমে, লজ্জায়। তুষেছ—সন্তুষ্ট করিয়াছ। পরিমলাকর—সুগন্ধের আকর।

তৃতীয় সর্গ

দণ্ডি—দণ্ড দান করিয়া, শাস্তি দিয়া। তার—রক্ষা কর। বিপত্তি-কালে—বিপদের সময়। বরি—বরণ করি। গৃহিলা—গ্রহণ করিলেন। খনিগর্ভে ফলে মণি—খনির মধ্যে যেমন মণি থাকে তেমনি কারাগারের মধ্যে হয় কৃষ্ণের জন্ম। স্বনিলা—শব্দ করিল। বৃষ্টিলা—বর্ষণ করিল। বালে—বালককে। পূতনারে—পূতনা নামক রাক্ষসীকে। কালনাগ—যমসদৃশ অর্থাৎ ভীষণ সর্প। বাসব—ইন্দ্র। রুষি—রাগ করিয়া। অরিন্দম—শত্রুনাশকারী। জলাসার—জলধারা, বৃষ্টিধারা। গোপ-বধূ-ব্রজ—গোপিনীসমূহ। যমুনা-পুলিনে—যমুনার তীরে। নবীন-নীরদবর্ণ—যাহার গায়ের রং নব-মেঘের মত শ্যামল। বরগুঞ্জমালা—সুন্দর কুঁচের মালা। বর—সুন্দর। সুগল-দেশে—সুন্দর গল-দেশে। পীতধড়া—হরিদ্রা রঙের বসন। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ—ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশ চিহ্ন, বিষ্ণুর চরণের চিহ্ন। শক্র-ধনু—ইন্দ্রধনু, রামধনু। তড়িৎ সুধরা অঙ্গে—মেঘের মধ্যে কৃষ্ণভ্রম হওয়ায় রুক্মিণী বিদ্যুতকে দেখিতেছেন কৃষ্ণের পীতধড়ারূপে। মন্দ্রে—গর্জন করে। শিখণ্ডি—(সম্বোধন) শিখণ্ডী, ময়ূর। শিখণ্ড-ময়ূরপুচ্ছ। মণ্ডে—মণ্ডিত করে; শোভাবর্ধন করে। ধূর্জটি—শিব। বরিবারে—বরণ করিতে। পাঞ্চজন্য—কৃষ্ণের শঙ্খ। বৈনতেয়—বিনতানন্দন, গরুড়। আইস, মুরারি···আপন তুলনা—এইখানে কবি কুমারী রুক্মিণীর বিনয়নম্র প্রেমের

ছবি আঁকিয়াছেন। রুক্মিণীর রূপগুণের বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নাই। বিষ্ণুর বাহন গরুড় যেমন চন্দ্রালোকে প্রবেশপূর্বক অমৃত হরণ করিয়াছিল, রুক্মিণীও তেমনি বিষ্ণুকে মিনতি করিয়া বলিতেছেন যে, গরুড়ের মত তিনি যেন আসিয়া তাঁহাকে বিদর্ভপুরী হইতে হরণ করিয়া লইয়া যান। কিন্তু তাহার পরই রুক্মিণী বলিতেছেন যে, গরুড় অমৃত আনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ত আর অমৃত নহেন, বিষ্ণু কিসের আকর্ষণে আসিবেন ? পশি—প্রবেশ করিয়া। ত্রাণ—ত্রাণ কর, রক্ষা কর। রোপেছি—রোপণ করিয়াছি। প্রবাহিণী—নদী। চিকণি—চিকণ করিয়া, সরু করিয়া। উদ্ধারহ—উদ্ধার কর। নাশিলা—বিনাশ করিলেন। হর—হরণ কর। হরে লয়ে…নিশার স্বপনে—এইখানে রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে জানাইতেছেন যে, কালরূপ শিশুপাল আসিবার অগ্রেই তিনি যেন আসিয়া তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যান। যিনি রাত্রির স্বপ্নে রুক্মিণীর মন চুরি করিতে পারিয়াছেন, তিনি যেন নিশ্চয়ই এখানে আসিয়া তাঁহাকে সশরীরে হরণ করিয়া লইয়া যান।

চতুর্থ সর্গ

নীচকুলোদ্ভবা—হীনকুলে যাহার জন্ম। ধ্বজ—পতাকা। পুরনারী-ব্রজ—পুরনারীবৃন্দ। হুলাহুলি—হুলুধ্বনি। গায়কী—গায়িকা। বিতরেন—প্রদান করিতেছেন। ধনজাল—ধনরত্ন। ঝাঁঝরি—কাঁসর জাতীয় বাদ্যবিশেষে। স্বস্ত্যয়ন—কাহারও কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত শাস্ত্রীয় কর্ম, মাঙ্গলিক কার্য। অকালে…যজ্ঞ ?—অযোধ্যাপুরীতে হঠাৎ এমন উৎসবের ধুম লাগিয়া গিয়াছে যাহা দেখিয়া কেকয়ীর বিস্ময় বোধ হইতেছে এবং তিনি তাই ব্যঙ্গচ্ছলে দশরথকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, তিনি কি অকালে কোনও যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ? আইবড়—অবিবাহিতা। নির্লজ্জ—লজ্জাহীন। অসত্যবাদী…অধর্মের পথে—রঘুকুলের নরপতিরা চিরকাল সত্যবাদী, সত্যভাষণ তাঁহাদের বংশানুক্রমিক গৌরব। কেকয়ী এখানে তাই দশরথকে ভর্ৎসনাপূর্বক মিথ্যাবাদী বলিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি প্রতিশ্রুত দিয়া তাহা রক্ষা করেন না এবং মুখে ধর্মের কথা বলিলেও, তাঁহার আচরণ অধর্মের পথে। অযথার্থ—যাহা প্রকৃত নহে। খেদাও—তাড়াইয়া দাও। অপবাদে—কলঙ্কে। ভুঞ্জিবে—ভোগ করিবে (এখানে, সহ্য করিবে)। বর্ত্তুল—গোলগাল। কটি—কোমর। নিন্দিতে তুমি সিংহে—অর্থাৎ রাজা আদর করিয়া বলিতেন যে, কেকয়ীর সরু কোমরের কাছে সিংহীর কোমরও হার মানে। এখানে 'কেশরী জিনিয়া মাঝ'—এই কথাটার প্রতিধ্বনি লক্ষণীয়। কুচ—স্তনযুগল। লইল লুটিয়া ……নীরসি কুসুমে—এখানে কৈকয়ী দশরথকে বলিতেছেন যে, তিনি এখন

বিগত-যৌবনা হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় রাজার আর তাঁহাকে ভাল লাগে না; গ্রীষ্মকালের উত্তাপ যেমন বাগানের ফুলের রস শোষণপূর্বক তাহার সৌন্দর্য নষ্ট করে, তেমনি কেকয়ীর যৌবনের রূপ ও সৌন্দর্য কাল কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। স্মর—মনে কর। কামী—কামুক। প্রবঞ্চনা.........মধুরসে—লম্পটপ্রকৃতি লোকের ইহাই প্রকৃতি যে, সে কৌশলে নারীর মন চুরি করিয়া তাহাকে প্রতারণা করে। পথী—পথিক। বাখানে—প্রশংসা করে। পড়ে কিহে···যত?—একদা দশরথ কেকয়ীর সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিয়াছিলেন। সেই পূর্বকথা তিনি এখানে রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। গুণীণেলাত্তম—গুণশীলে শ্রেষ্ঠ। কুহক—যাদু, ইন্দ্রজাল। অভীষ্ট—মনোবাঞ্ছা। পূর্ণিতে—পূর্ণ করিতে। বাক্য-ব্যয়—কথা বলা অর্থাৎ ভর্ৎসনা। বিতংস—পশু-পক্ষী ধরিবার ফাঁদ বা জাল। কেশরী—সিংহ। অম্বর—আকাশ। কাদম্বিনী—মেঘ। নাদে—গর্জন করে। রাজে—রাজাকে। খোদিব—উৎকীর্ণ করিয়া দিব। তুঙ্গ—উচ্চ। শৃঙ্গদেহে—পাহাড়ের গায়ে। পল্লী-বাল-দলে—পল্লীর বালকদিগকে। পিতৃমাতৃহীন পুত্রে—ভরতকে; পিতামাতা বর্তমান থাকিতেও দুর্ভাগ্য ভরত মাতৃপিতৃহীনের তুল্য। বাছনি—বাছা, বৎস, অর্থাৎ ভরত। দিব্য—শপথ।

পঞ্চম সর্গ

ভ্রম—ভ্রমণ কর। বৈশ্বানর—অগ্নি। কে তুমি......পূর্ণশশী আজি—সূর্পণখা প্রথম দর্শনেই লক্ষ্মণের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছে। তাই সে ভস্মাচ্ছাদিতদেহ জটাজূটধারী লক্ষ্মণের মধ্যে রূপযৌবনসম্পন্ন দিব্যকান্তি এক যুবককে আবিষ্কার করিয়াছে। তাহার মনে হইয়াছে ভস্মের মধ্যে যেমন আগুন থাকে, মেঘের অন্তরালে যেমন পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করেন, তেমনি সন্ন্যাসের আবরণে লক্ষ্মণ তাঁহার অনিন্দ্যকান্তি লুকাইয়া রাখিয়াছেন। মঞ্জুকেশি—(সম্বোধনের পদ) সুকেশী। নিশাযোগে—রাত্রিকালে। বরাঙ্গ—সুন্দর দেহ। বলি (সম্বোধনে)—বলবান্। বঞ্জুল—বেত। মঞ্জুলে—কুঞ্জে। ভব-সুখে—সংসারের সুখে। বিমুখ—বিরাগী। আবরি—আবৃত করিয়া, ঢাকিয়া। ক্ষীণ, ক্ষুণ্ণ খেদে—সামান্য দুঃখে। বৈজয়ন্ত-ধাম—স্বর্গে ইন্দ্রের প্রাসাদ। শচীকান্ত—ইন্দ্র। ত্রস্ত—ভীত। যুঝিবে—যুদ্ধ করিবে। আদেশিলে—আদেশ করিলে। ভীমখাণ্ডা—ভীষণ খাঁড়া। অলকার ভাণ্ডার—ধন এবং ঐশ্বর্যের দেবতা কুবের, কুবেরের পুরীর নাম অলকা। শুষি—শোষণ করিয়া। মণিযোনি—মণির উৎপত্তিস্থল। বাঞ্ছা—বাসনা। অনিমেষে—তৎক্ষণাৎ। কামরূপা—যথেচ্ছা-রূপধারিণী। সেবে—সেবা করে। মাঝ—মেঝে। খচিত—সজ্জিত। গবাক্ষ—

জানালা। দ্বিরদ-রদ—হস্তিদন্ত। কপাট—দরজা। সুকল—সুমিষ্ট। উথলে—উত্থিত হয়। বীণাবাণী—বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় সুমিষ্ট বাক্য যেসব মেয়ের। কলে—শব্দে। পূজি—পূজা করি। আবরি—আচ্ছাদিত করি। ঘুচাইয়া—খুলিয়া ফেলিয়া, ভাঙিয়া। বেণী—খোঁপা। খণ্ডি—খণ্ডিত করি। বিপিন-জনিত—কাননে উৎপন্ন। লেপি—লেপন করি। ডরে—ভয় পায়। শমী—শমী বৃক্ষ। সূর্যমুখী......পানে—সূর্যমুখী ফুল সর্বদাই সূর্যের দিকে মুখ করিয়া থাকে। সূর্পণখাও তেমনি লক্ষ্মণ যেখান দিয়া চলা-ফেরা করিতেন, সেইখানে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাঁহাকে চাহিয়া দেখিত। সূর্যমুখী ফুলের উপমাটিতে সূর্পণখার প্রেমের গভীরতা প্রকাশ পাইয়াছে। নিগড়—শৃঙ্খল। বদ্ধা—বাঁধা। ভালে—কপালে। হব্য-ভস্ম—হোম-ভস্ম। উদয়ে—উদয় হয়। বসিব ...বেশে—সন্ধ্যাবেলায় গোদাবরীর পূর্বতীরে লক্ষ্মণকে আসিতে অনুরোধ করিয়া সূর্পণখা নিজেকে কুমুদিনীর সহিত তুলনা করিয়াছে। সন্ধ্যার পর চন্দ্র উঠিলে আনন্দে কুমুদিনী যেমন তাহার দলগুলি মেলিয়া ধরে, সেইরূপ চন্দ্ররূপ লক্ষ্মণের উদরে সূর্পণখার প্রেমের কুমুদ প্রস্ফুটিত হইবে। নিবিড়—গভীর। আশু—শীঘ্র। বিরাগ-রাগে—বিরক্তি প্রকাশ করিয়া। আইস মলয়-রূপে...বিরাগ-রাগে—এই উক্তি দ্বারা সূর্পণখার হৃদয়ের ব্যাকুলতা অতি চমৎকারভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সে নিজেকে ফুল কল্পনা করিয়া লক্ষ্মণকে মলয়-বাতাসরূপে তাহার নিকট আসিতে বলিতেছে। যদি ফুল গন্ধহীন মনে হয় তবে মলয় বাতাস যেন ফিরিয়া যায়, অর্থাৎ যদি তাহাকে রূপহীনা মনে হয় তবে লক্ষ্মণ যেন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। আবার সূর্পণখা লক্ষ্মণকে ভ্রমররূপে আসিতে বলিতেছে। ভ্রমর যেমন কুসুমে রস না পাইলে সেই ফুলের উপর বসে না, তেমনি সূর্পণখাকে দেখিয়া লক্ষ্মণের যদি ভাল না লাগে, তবে তিনিও যেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সে কোনও আক্ষেপ করিবে না। কন্দর্প-গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারি—যিনি মদনের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। বালাই—অমঙ্গল। সম—যোগ্য। বিরলে—নিভৃতে, একান্তে।

ষষ্ঠ সর্গ

ত্রিদশালয় বাসি—স্বর্গে যিনি বাস করেন। কান্ত—নাথ। সেবে—সেবা করেন। দিবে—স্বর্গে। সুলোচনা—আয়তলোচনা। দেব-ভোগ-ভোগী—যিনি দেবতার উপভোগ্য বস্তু ভোগ করেন। পীন-পয়োধরা—যাহার স্তনযুগল স্থূল। নিবিড় নিতম্বী—নিতম্ব দেশ (পাছা) যাহার প্রশস্ত। সুমধ্যমা—যাহার কোমর সরু। মন্দার-মণ্ডিত—মন্দার পুষ্পের দ্বারা সজ্জিত। সুমৃণাল-ভুজে—সুন্দর মৃণালের ন্যায় বাহুবেষ্টনে। শিলীমুখ—ভ্রমর। সরোরোধঃ—সরোবর-তীর। গন্ধামোদে—সুগন্ধে। স্বনয়নে—

স্বচক্ষে। দণ্ডিলা—শাস্তি দিল। সুধিব—জিজ্ঞাসা করিব। সরোজিনী—পদ্ম। লুটে—লুণ্ঠন করে। সৃজিলা—সৃষ্টি করিল। সৃজিলা কমলে…তোমার বিহনে—এইখানে দ্রৌপদীর মনের বিরহভাবটি পরিস্ফুট করিবার জন্য কবি তাঁহাকে পদ্মের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ভগবান্ দুইজনকেই সৃষ্টি করিয়াছেন—পদ্মকে এবং দ্রৌপদীকে। সূর্যের বিরহে পদ্ম যেমন দুঃখে মলিন হইয়া নতমুখী হইয়া যায়, তেমনি অর্জুনের অদর্শনজনিত বিরহে দ্রৌপদীরও সেই অবস্থা হইয়াছে। মিহিরে—সূর্যকে। আঁধার মহারণ্য যেন—সেই পদ্মের উপমাকে আরও বিস্তৃত ব্যঞ্জনা দেওয়া হইয়াছে। সূর্য অস্ত যাইবার পর যদি বাতাস আসিয়া সোহাগ করে, কিংবা ভ্রমর আসিয়া কলগুঞ্জনে সাধে, তথাপি পদ্ম আর মুখ তুলিয়া চাহে না; সূর্যের অদর্শনে তাহার পৃথিবী অন্ধকার। ঠিক সেই রকম অবস্থা দ্রৌপদীর মনের। অর্জুনের বিরহে তাঁহারও পৃথিবী অন্ধকার। কবি এই উপমা দ্বারা অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর প্রেমের গভীরতা সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ডরে—ভয় পায়। যাজ্ঞসেনী—যজ্ঞসেনের (দ্রুপদ রাজার) কন্যা। বিবশা—বিগলিত হৃদয় যাহার। বৈদর্ভী—বিদর্ভ-রাজকন্যা, দময়ন্তী। বাহন যাঁহার…তাঁর আমি—মেঘকুলপতি যে ইন্দ্রের বাহন, আমি তাঁর পুত্রবধূ। তোষ—তুষ্ট কর। বারিদ-পদে—মেঘের পায়ে। লক্ষ্য—মৎস্যচক্র। বৈশ্বানর—অগ্নি। বেড়িল—বেষ্টন করিল। অম্বুরাশি…স্বয়ম্বরে—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় ছদ্মবেশী অর্জুন যখন লক্ষ্য ভেদ করেন তখন সমাগত রাজন্যবৃন্দ তুমুল কোলাহলে পঞ্চপাণ্ডবকে আক্রমণ করেন। সেই কোলাহল যেন মেঘগর্জন ও সাগর-গর্জনের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। সম্বোধি—সম্বোধন করিয়া। তিতিতে—ভিজাইতে। আঁধা—অন্ধ। কালি—গত কাল; এই কথাটিতে মনে হয় দ্রৌপদী তাঁহার লিপিখানি একদিনে লিখিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। নয়ন আসারে—চোখের জলে। সান্ত্বনি—সান্ত্বনা দিই। তপ্তা—উত্তপ্ত। ত্রিদিব—স্বর্গ। বার্তা—সংবাদ, সমাচার। ইচ্ছা বড়…কুন্তলে—অর্জুনকে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে বলিবার সময়, দ্রৌপদী তাঁহাকে স্বর্গের পারিজাত গোটাকতক আনিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। বৃহৎ অনুরোধের সহিত স্ত্রীজনোচিত এই ক্ষুদ্র অনুরোধটি সুন্দর হইয়াছে। কামদা—অভীষ্টদাত্রী। কামধুকে—কামদাত্রী অর্থাৎ অভীষ্টদাত্রী অমরাবতীকে। বল্যে—বলিয়া। স্বর্ণ-অলঙ্কার…চরণে—যাহারা হাতে, গলায় এবং মাথায় সোনার গহনা পরে, তাহারা কি রূপার অলঙ্কার পরিধান করে না? এই কথার দ্বারা দ্রৌপদী নারীহৃদয়ের একটি সূক্ষ্ম প্রণয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্জুন এখন স্বর্গে ইন্দ্রের অতিথি হইয়া আছেন। স্বর্গের অপ্সরাবৃন্দ হয়ত এখন তাঁহার সেবা করিতেছে;

তবুও মানবী-দ্রৌপদী দাসী হিসাবেও কি অর্জুনের সেবা করিবার অধিকার পাইতে পারে না? বিকট—ঘোর। তুষেন—সন্তুষ্ট করেন। নির্বাহে—নির্বাহ করেন; চালাইয়া দেন। তিতেন—ভিজিয়া যান। মহেষ্বাস—মহাধনুর্ধর। বিমুখিবে—পরাস্ত করিবে। ভ্রাতৃ-ত্রয়ে—ভ্রাতা চারিজনকে হইবে। স্বেচ্ছাচার—যিনি ইচ্ছামত সর্বত্র ভ্রমণ করিতে সক্ষম।

সপ্তম সর্গ

চখে—চক্ষে। ঝলা—ঝলক, আলো। অন্ধ-নরপতি—ধৃতরাষ্ট্র। নয়ন-আসারে—চোখের জলে। খেদে—দুঃখে। মহিষী—গান্ধারী। মাতুল—শকুনি। অক্ষবিদ্যা—পাশাখেলা। মরি—আহা। এ বিপুল···বিপুল-কুলে—কৌরবের বিরাট বংশ যে দুষ্টবুদ্ধি মাতুল শকুনির জন্যই ধ্বংস হইতে বসিয়াছে, সেই কথাই ভানুমতী তাঁহার স্বামী দুর্যোধনকে পত্রে লিখিয়া জানাইতেছেন। কলি যেমন শ্রীবৎসরাজার দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, সেইরকম শকুনিও কাল-কলির মত কৌরবের বিপুলকুলে প্রবেশ করিয়া ইহাকে মজাইতেছে। প্রহরী—প্রহরণধারী। মেদিনী-সদনে রমা দ্রুপদ-নন্দিনী—দ্রৌপদী যেন এই পৃথিবীর গৃহে লক্ষ্মী-স্বরূপা; অথবা দ্রৌপদী হইলেন পৃথিবীর গৃহ-লক্ষ্মী। গঙ্গাজল···জলে—কৌরবের সর্বনাশ আসন্ন। কুরুক্ষেত্রের কালসমরে পতির পরাজয় যে অবধারিত, ইহাই বুঝাইবার জন্য ভানুমতী দুর্যোধনকে লিখিয়া জানাইতেছেন যে, তিনি গঙ্গাজলপূর্ণ ঘট দূরে নিক্ষেপ করিয়া কর্মনাশা-জলে স্নান করিতেছেন; অর্থাৎ বন্ধু এবং গুরুজনের হিতবাক্য না শুনিয়া কর্ণ এবং শকুনির প্ররোচনায় তিনি ধ্বংসপথের যাত্রী হইয়াছেন। অবহেলি···ভকতি—পূর্বেকার ভাবটিকে আরও বিস্তৃত করা হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে অবহেলাপূর্বক অধম চণ্ডালে ভক্তি করিলে যাহা হয়, দুর্যোধন ঠিক তাহাই করিতেছেন এবং ইহার পরিণাম যে শুভ নহে, ভানুমতী তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। অম্বু-বিম্ব—জল-বুদ্‌বুদ্‌। অম্বু-বিম্ব···মুক্তাফল—জলের উপরে যে জল-বুদ্‌বুদ্‌ দেখা যায় অথবা ফুল ও দূর্বার পাপড়ির উপর যে জলবিন্দু টল্‌টল্‌ করে, সেগুলি মুক্তার মত দেখিতে হইলেও যেমন সত্যই মুক্তা নয়, তেমনি এ জগতে অনেককে মিত্র বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা মিত্র নহে। পরমারি—পরম-শত্রু। আনায়—জাল, ফাঁদা। হে দয়া···বসতি?—ভানুমতীর অন্তরের বেদনা এই কথা কয়টিতে বড় সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যে-পাণ্ডব কৌরবের দুর্দিনে তাঁহাদের প্রাণ এবং মান রক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই, সেই পাণ্ডবদিগের দয়ার প্রতিদান তাঁহার স্বামী যে এইভাবে দিবেন, ইহাই ভানুমতীর অন্তরকে বেদনার্ত করিয়া

তুলিয়াছে, সেই জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মানুষের হৃদয়ে দয়ামায়া কি জন্য রহিয়াছে? নীরবৃন্দ—নীরবিন্দু হইবে। দেহ ক্ষমা—ক্ষান্ত হও। কর্ণদান কর—তাহার কথা শুন। রাধেয়—রাধার পুত্র, কর্ণ। সূতপুত্র—সারথিপুত্র, কর্ণ। স্নেহপ্রবাহিণী… পাণ্ডব-সাগরে—দুর্যোধনের স্বপক্ষে আছেন ভীষ্ম এবং দ্রোণ, এবং ইহাই তাঁহার গর্বের হেতু; কিন্তু ভানুমতী স্বামীকে বলিতেছেন যে, ইহারা তাঁহার দিকে আছেন সত্য, কিন্তু অন্তরে ইহারা পাণ্ডবদিগের প্রতি স্নেহশীল। প্রবোধি—প্রবোধ দিই, সান্ত্বনা দিই। উত্তর গোগৃহ-রণে—বিরাট রাজার পুত্র উত্তরের বিখ্যাত গো-শালা হইতে গো-ধন অপহরণ করিতে দিয়া কৌরবপক্ষের সহিত বৃহন্নলারূপী অর্জুনের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ সকলেই পরাজিত হন। জিষ্ণু—বিজয়ী, অর্জুন। কপিধ্বজ—অর্জুনের রথের পতাকায় হনুমানের মূর্তি অঙ্কিত থাকে বলিয়া ইহাকে কপিধ্বজ বলে। স্যন্দন—রথ। কালরূপী—যমরূপী। কোদণ্ডোত্তম—প্রশস্ত ধনু। ইরম্মদ—অগ্নি। দেবদত্ত-ধ্বনি—অর্জুনের শঙ্খের নাম দেবদত্ত, সেই ভীষণ শঙ্খ ধ্বনি। বায়ুজধ্বজে—কপিধ্বজে (বায়ুজ—বায়ু অর্থাৎ পবনের পুত্র)। উগরিয়া—উদ্গার করিয়া। চন্দ্রকলা যেন চন্দ্রচূড়-ভালে—চন্দ্রচূড় হইলেন মহাদেব, কারণ তাঁহার মাথায় চন্দ্র অবস্থিত। সুতরাং অর্থটি হইল, শিবের কপালে চন্দ্রকলার ন্যায়। কুজনি—কুজন করিয়া। উন্মদ—মত্ত। জবাযুগ-সম আঁখি—দুইটি জবাফুলের মত রক্তবর্ণ চক্ষু। দণ্ডধর-হাতে—যমরাজের হাতে। নর-যমে—যে পরাক্রম মানুষের যমস্বরূপ; কথাটি ভীমের বিশেষণ। কুহক—মায়া। নমিনু—প্রণাম করিলাম। চমকি—চমকিত হইয়া। উজ্জ্বলিল—উজ্জ্বল করিল। খণ্ডাতে—এড়াতে। তরাসে—ত্রাসে, ভয়ে। ভীম—ভীষণ। মশান—শ্মশানে শব্দের অপভ্রংশ। ছেদিতে—ছেদন করিতে। মহী—পৃথিবী। আভাহীন—নিস্তেজ। অদূরে দেখিনু হ্রদ—দ্বৈপায়ন হ্রদের কথা বুঝাইতেছে। "কেন এ কুস্বপ্ন, দেব দেখাইলা মোরে"—এই স্বপ্ন বৃত্তান্তটি পত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া কবি ভানুমতীর মনের অবস্থা অতি নিপুণভাবে বুঝাইয়াছেন। তাঁহার বিষাদাক্রান্ত মনের অবস্থা এই স্বপ্নের সহযোগে সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে।

অষ্টম সর্গ

যোধ—বীর। নিবারে—নিবারণ করে। নীরবিলা—নীরব হইল। দূরদর্শী—হস্তিনায় বসিয়া যিনি কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গন দেখিতেছিলেন, সঞ্জয়। নাদিছে—হুঙ্কার করিতেছে। আর্জ্জুনি—অর্জুনের পুত্র, অভিমন্যু। হ্রেষিছে—হ্রেষাধ্বনি করিতেছে। কোদণ্ড-টংকার—ধনুকের ছিলার আওয়াজ। নির্ঘোষে—ভীষণ শব্দে। যুঝিছে—যুদ্ধ করিতেছে। নীরবিয়া—চুপ করিয়া। পৌরব-কুল-ইন্দু—পুরু-বংশের চন্দ্রস্বরূপ

অভিমন্যু। কুলদেবে—বংশের দেবতায়। পাণ্ডু-গণ্ড...কোপে—হে নাথ, অর্জুনের ক্রোধে (দুর্যোধনরা তো বটেই, এমন কি) পাণ্ডবেরাও ভয়ে বিবর্ণ হইয়াছেন। ভূতদেশে—যমালয়ে। পূর্বকথা—জয়দ্রথকর্তৃক দ্রৌপদীহরণের কথা। দণ্ডিতে—দণ্ড দিতে। অজাগর—অজগর হইবে। রুষিলে—ক্রোধ করিলে। শিবা—শৃগাল। পৌরব-পঙ্কজ-রবি—পৌরবরূপ পদ্মসমূহের রবি, অর্থাৎ ভীষ্ম। বীর্য্যাঙ্কুর—যাহার বীরত্ব স্ফুটনোন্মুখ। হতজীব—মৃত। ত্যজ—ত্যাগ কর। বলী—বলশালী। কি ভেদ··· হিমাদ্রিতে?—হিমালয় পর্বত হইতে যে দুইটি নদ উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে যেমন কোনও পার্থক্য থাকে না, তেমনি কুরুবংশ ও পাণ্ডুবংশ একই চন্দ্রবংশের দুইটি শাখা—এই উক্তিদ্বারা দুঃশলা তাঁহার স্বামীকে ইহাই বুঝাইতেছেন যে, কৌরব এবং পাণ্ডব উভয়ই তাঁহার সমান কুটুম্ব, অতএব কেবল মাত্র একজনের পক্ষ অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত নহে। রজস্বলা—ঋতুমতী। উলঙ্গিতে—বিবস্ত্র করিতে। সরে—অগ্রসর হয়। নিন্দে—নিন্দা করে। দেবযোনি জয়ী—যিনি দেবযোদ্ধাকেও জয় করিয়াছেন। আখণ্ডল—ইন্দ্র। খাণ্ডব দাহনে—খাণ্ডববন যখন পুড়িয়া গিয়াছিল। মণিভদ্র—জয়দ্রথের পুত্র (মধুসূদনের কল্পনা)। নিশার···তোমারে—পত্রের পরিশেষে দুঃশলা স্বামীকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য শিশুপুত্রের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন যে, রাত্রির শিশির যেমন রসদানপূর্বক মুকুলকে পালন করে, পিতৃস্নেহ তেমনি শৈশবে শিশুর জীবনস্বরূপ। ডরাও—ভয় পাও। কপোত-মিথুন—কপোত-দম্পতী।

নবম সর্গ

এ চিরবিচ্ছেদ···তোমারে—জাহ্নবীদেবী বিবাহের পূর্বেকার সর্ত অনুসারে অষ্টম পুত্র জন্মিবার পর যখন শান্তনুকে পরিত্যাগ করিয়া যান, তখন তাঁহার স্বামী পত্নীর বিরহে কাতর হইয়া উদাসীর মত গঙ্গার তীরে তীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। স্বামীর দুঃখ দেখিয়া পত্রযোগে জাহ্নবীদেবী তাঁহাকে সব ভুলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছেন। নিদ্রাভঙ্গের পর লোকে যেমন স্বপ্নের কথা বিস্মৃত হয়, তেমনি জাহ্নবী শান্তনুকে বুঝাইতেছেন যে, এই চিরবিচ্ছেদের দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র ঔষধ বিস্মৃতি। সরোষে—ক্রোধের সহিত। বসুদলে—অষ্টবসুকে; এই অষ্টবসুর অন্যতম হইলেন ভীষ্মদেব। নিষ্কৃতি—শাপমুক্তি। সাধে—ইচ্ছায়। বরিণু—বরণ করিলাম। সরোরুহ—পদ্ম। জাহ্নবীপুত্র···চন্দ্রচূড়ে—জাহ্নবীদেবী শান্তনুকে লিখিতেছেন যে তাঁহাদের অষ্টম নন্দন দেবব্রতকে দিয়া তিনি এই পত্র পাঠাইতেছেন। কালে এই মহাবলশালী পুত্র চন্দ্রবংশ উজ্জ্বল করিবে এবং ভারতের

ললাটে শোভা পাইবে, যেমন মহাদেবের ললাটে চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ
চন্দ্রদেব শোভা পাইয়া থাকেন। এই উক্তিদ্বারা জাহ্নবীদেবী দেবব্রতের
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়াছেন। ভুল—ভুলিয়া যাইও। সরসে—সরোবরে,
সরসীতে হওয়া উচিত, ছন্দের খাতিরে 'সরসে' করা হইয়াছে)। আভজ্ঞান—
স্মারক, নিদর্শন পরিচায়ক বস্তু। গ্রহ—গ্রহণ কর। বরি—বরণ করি।
(বরাঙ্গী—সুন্দরী। রাজেন্দ্রবালে—রাজকন্যাকে। পাল—প্রতিপালন কর। দম—
দমন কর। দণ্ড—শাস্তি দাও। সুরাজনীতি—শ্রেষ্ঠরাজনীতি। সাধি—অনুষ্ঠান
করিয়া, সম্পন্ন করিয়া। সৎক্রিয়া—সৎকর্ম, পুণ্যকর্ম। কালে—ভবিষ্যতে। প্রদীপ
…সে তেজস্বী—প্রদীপের উপমা দিয়া কবি জাহ্নবীর লেখনীমুখে ইহাই বুঝাইতে
চাহিয়াছেন যে, যে-প্রদীপ হইতে আর একটি প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়, সে-টিও সমান
তেজেই জ্বলিতে থাকে ; সেইরূপ শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম পিতার মতই মহাযশা হইবে।
কয়ে—কহিয়া, বলিয়া। হস্তিগতি—হাতী যেমন মর্যাদার সহিত চলিয়া থাকে
সেইরূপ মর্যাদা ভরে।

দশম সর্গ

স্বর্গচ্যুত—স্বর্গভ্রষ্ট। অভিনিনু—অভিনয় করিলাম। দেব নাট্যশালে—স্বর্গের
রঙ্গমঞ্চে। অম্ভোজা—জলজা, সমুদ্র হইতে উত্থিতা, লক্ষ্মী। ধায়—অগ্রসর হয়।
ভরতঋষি—নাট্যাচার্য ভরতমুনি। ছার—সামান্য। বিহনে—অভাবে। কেশী—
কেশী দৈত্য। হরিল—হরণ করিল। স্বনে—আওয়াজে, শব্দে। মীলিল—উন্মীলিল,
মেলিল। রহিনু··· কমল—এই কথার দ্বারা উর্বশী পুরুরবার প্রতি তাঁহার হৃদয়ের
প্রেম ব্যক্ত করিয়াছেন। মূর্চ্ছিতা উর্বশীকে পুরুরবা যখন দৈত্যহস্ত হইতে উদ্ধার
করেন, তখন উর্বশী পুরুরবাকে দেখিয়া লজ্জায় চক্ষু দুইটি খুলিতে পারেন নাই ;
কিন্তু দিনশেষে চন্দ্রকে দেখিয়া কুমুদ যেমন তাহার দল মেলিয়া দেয়, উর্বশীর
মনের চক্ষুও সেইরূপ আনন্দে উন্মীলিত হইয়াছিল। কমলাকান্তে—ইহা কমল-কান্তে
হইবে ; সূর্য। ছিন্নধূমপুঞ্জ-কায়া—যে অগ্নিশিখার দেহখানি ধূম-কুণ্ডলীর স্পর্শশূন্য।
দিনের বেলাতে অগ্নি-শিখার আশে-পাশে যে ধোঁয়া থাকে, রাত্রিকালে তাহা আর
দেখা যায় না, তখন কেবল আগুনের লাল আভাই পরিষ্কার দেখা যায়। উর্বশী
যতক্ষণ মোহাচ্ছন্ন ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার সৌন্দর্য ছিল ঐ মোহ-জনিত ক্লান্তিতে
কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন—ঠিক যেন দিনের বেলাকার অগ্নি-শিখার ন্যায় ; কিন্তু এখন

মোহ-ভঙ্গ হওয়ায় সেই দেহসৌন্দর্য রাত্রিকালীন অগ্নিশিখার ন্যায় নির্মল ও উজ্জ্বল হইয়াছে।

বরাঙ্গ—শ্রেষ্ঠ দেহ। বররুচি—শ্রেষ্ঠ (উজ্জ্বল) দীপ্তি। রিচ্যমান—এই কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এখানে আদৌ সঙ্গত হয় না, 'সংযুক্ত', বা 'সম্পৃক্ত' বলিতে এখানে কোন অর্থবোধ হয় না। মনে হয়, কথাটি 'রিচ্যমান' না হইয়া 'রুচ্যমান' হইবে। 'রুচ্যমান' অর্থে 'কান্তিমান' বুঝায়, অর্থাৎ যাহার কান্তি বা আভা এখন ক্রমশঃ ফুটিতেছে।

ভাঙিলে পাড়…প্রসাদে—গঙ্গার জল অতি নির্মল। কিন্তু তাহার যদি পাড় ভাঙিয়া পড়ে, তবে কিছুক্ষণের জন্য জলটি ঘোলা হইয়া যায়, পরে আবার নির্মল স্রোতে পূর্ববৎ আনন্দে প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। উর্বশীর সৌন্দর্য যেন জাহ্নবী স্রোত, আর তাঁহার মোহ যেন গঙ্গার পাড়-ভাঙা। এবে–এখন। প্রসাদে—হর্ষে, আনন্দে। বাখানি–প্রশংসা করি। দাম—মালা। সুর-পুর-চির-অরি—যাহারা স্বর্গের চির শত্রু, অর্থাৎ দানবগণ। বজ্রী—যিনি বজ্র ধারণ করেন। মনোজ—মনে যাহা জন্মায়। উর্বীধামে—পৃথিবীতে। দেহ—দাও। উর্বীশ–রাজা, পৃথিবীর ঈশ্বর বা পতি। বিষের ঔষধ…কৃপা করি—উর্বশী পুরুরবাকে দেখিয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন এবং কামবিষে জর্জরিতা হইয়াছিলেন; এমন সময়, অভিনয়কালে ভারতঋষির অভিশাপ বিষরূপে উর্বশীর জ্বালা জুড়াইল অর্থাৎ তিনি মর্ত্যে আসিয়া আবার পুরুরবার সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পাইলেন। কল্পতরু—স্বর্গের বৃক্ষ ; ইহার নিকট যে যাহা কামনা করে তাহার সে অভিষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। বীচিরবে—তরঙ্গের শব্দে। উত্তরার্থে—উত্তরের জন্য পৃথ্বীনাথ–রাজা।

একাদশ সর্গ

রাজকেতু—রাজপতাকা। প্রতিবিধিৎসিতে—প্রতিবিধান করিতে। লোহে—রক্তে। টুট—ভাঙ্গ, খর্বকর। কিরীটি—অর্জুন। মহেষাস—মহাধনুর্ধর। জন্ম—জন্মিলে। পাল—পালন কর। পুত্রহা—পুত্রহন্তা। দারুণ …. জ্ঞান তব?—পুত্রশোকাতুরা জনা পত্রযোগে তাঁহার স্বামী নীলধ্বজকে লিখিতেছেন, যে নিষ্ঠুর ভগবান্ তাঁহাদের একমাত্র পুত্র প্রবীরকে হরণ করিয়া রাজ্য অন্ধকার করিয়া দিয়াছেন, সেই বিধাতা কি নীলধ্বজের জ্ঞানও হরণ করিয়া লইয়াছেন অর্থাৎ নীলধ্বজ পুত্রহত্যার প্রতিশোধ লওয়ার কর্তব্য বিস্মৃত হইয়াছেন। পরশ—স্পর্শ কর। চর্ম–ঢাল। স্বৈরিণী—দ্বিচারিণী, বহু-বল্লভ! গায়েন—গাহিয়া

থাকেন। পৌরব-সরসে নলিনী—পৌরব নারী সমাজরূপ সরোবরে পদ্মস্বরূপ। অধীনী—অধীনা। রমা—লক্ষ্মী। রাজে—রাজন্যবর্গকে। ছলিল—বঞ্চনা করিল। আক্রমে—আক্রমণ করে। আত্মশ্লাঘা—আত্মগৌরব। চণ্ডালের······ভালে—এই সুতীব্র ভর্ৎসনার দ্বারা জনা স্বামীর হৃদয়ে প্রতিহিংসা জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে কপালে চণ্ডালের পদধূলিধারণ যেমন অসঙ্গত এবং কাপুরুষোচিত, মহাবীর নীলধ্বজের পক্ষে পুত্রহন্তা অর্জুনের নিকট নতশির হওয়া ঠিক তেমনি অসঙ্গত ও অশোভন বলিয়া জনার মনে হইতেছে। কুরঙ্গীর · নীরবয়ে কবে ?—নীলধ্বজের অন্তরে পুত্রশোকের দাবানল কুরঙ্গীর অশ্রুর ন্যায় অর্জুনের দুটি কোমলমিষ্ট কথায় কিরূপে নির্বাপিত হইল জনা তাহা বুঝিতে পারেন না। এই একই বিস্ময়প্রকাশের জন্য বলা হইতেছে, কোকিলের মধুর ডাক কি কখনও ঝড়ের প্রবল শব্দ ডুবাইতে পারে? সাজে—সাজে। যোধে—বীরকে। ধাতা—বিধাতা। বাম—অপ্রসন্ন। এ জনাকীর্ণ···জনার পক্ষে—একমাত্র পুত্রকে যুদ্ধে হারাইয়া জনার চক্ষে জনসমাকুল পৃথিবী জনহীন মনে হইতেছে। এই উক্তিটির মধ্যে, জনার অন্তরের এক অসহনীয় রিক্ততার চিত্র সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মাতৃধার—মাতৃঋণ। বরষিস—বর্ষণ করিস। বিবরে—গর্তে। কৃতান্তনগরে—যমালয়ে।

———